বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ও বিরোধীদলের ভূমিকা

(২০০১-২০০৬)

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
এম ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ২৯১
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৩-২০০৪

এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

467596

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই ২০১০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M.

467596

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ও বিরোধীদলের ভূমিকা (২০০১-২০০৬)

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ও বিরোধীদলের ভূমিকা (২০০১-২০০৬)

এ কে এম শহীদুল্লাহ
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ২৯১
শিক্ষাবর্ষ ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

467596

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভটি দাখিল করা হল)।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মাকে

467596

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ:

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ও বিরোধীদলের ভূমিকা (২০০১-২০০৬)' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ২৯.০৭.১০
এম ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ২৯১
শিক্ষাবর্ষ ২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারিখঃ

প্রফেসর এ কে এম শহীদুল্লাহ
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম ফিল ডিগ্রির জন্য মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কর্তৃক 'বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ও বিরোধীদলের ভূমিকা(২০০১-২০০৬)' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানা মতে এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

২৯/৭/২০১০

প্রফেসর এ কে এম শহীদুল্লাহ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

A.K.M. Shahidullah
Professor, Political Science (Rtd)
Dhaka University

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ হতে মুক্তি লাভ করে। এভাবে, বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নেয়। পরিণতিতে, ১৯৭২ সালে দেশটি রাষ্ট্রপরিচালনার রূপরেখা হিসেবে একটি সংবিধান প্রনয়ণ করে যাতে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থান পায়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সংসদীয় শাসন পদ্ধতির বিকাশকে ব্যাহত করে এবং বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করে স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসন। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যেমন মুক্ত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে তেমনি সম্মুখীন হয়েছে নানা রকম কালো আইন ও দমনমূলক নীতির। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলো স্বৈরতন্ত্র ও সামরিক শাসকের সাথে আপোস করেনি। বরং তারা গণতন্ত্র তথা প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামকে অব্যাহত রেখেছে। অবশেষে, ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ফলে এদেশের জনগণ তাদের দীর্ঘ আকাঙ্খিত সংসদীয় গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ লাভ করে। অতঃপর ১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচন জাতিকে একটি প্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার পথ দেখায়। শুধু তাই নয়, এ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভার পাশাপাশি দেশব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের আর্বিভাব ঘটে। আমার গবেষণাটি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকাকে উপজীব্য করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ক্ষমতাসীন দলের পাশাপাশি বিরোধী দল আইনসভা এবং আইনসভার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিরোধী দল সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি জনগণের সামনে তুলে ধরে।

১৯৯১ সালে এদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে পারস্পরিক সমঝোতা পদ্ধতিটির সফলতা সম্পর্কে জনমানুষের মধ্যে প্রবল আশার সঞ্চার করে। সাংবিধানিক বিরোধীতার গুরুত্বকে মুখ্য বিবেচনা করে আমি বিরোধী দলের রাজনীতি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে গবেষণাটি পরিচালনা করতে বিশেষভাবে প্রয়াসী হই। এ গবেষণায় ৮ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকাকে উপজীব্য করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেকোন সৃজনশীল কাজ সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূভাবে করতে হলে বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ, গুরুজন সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণায় অনেকের থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। কাজের মূল্যায়নের পূর্বে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

আমি প্রথমেই স্মরণ করছি অধ্যাপক এ কে এম শহীদুল্লাহ স্যারের কথা। তিনি তাঁর শত ব্যস্ততা স্বত্ত্বেও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে দায়িত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধায়নে গভীর প্রজ্ঞার সাথে বাস্তব দিক নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগধর্মী আলোকপাতের মাধ্যমে আমার সকল প্রকার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে নতুন একটি গবেষণা সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনে হাতে কলমে অনুপ্রাণিত করেছেন।

গবেষণা প্রতিবেদনটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে গিয়ে আমি কতিপয় সহানুভূতিশীল মানুষের সান্নিধ্য লাভ করি। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

গবেষণা কাজের জন্য আমি দেশী-বিদেশী অনেক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও জার্ণালের সহযোগিতা নিয়েছি। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি।

যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য আহরণে জার্ণাল, পত্র-পত্রিকা দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ কামরুজ্জামান
এম.ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৩-২০০৪
রেজিঃ নং- ২৯১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯ মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ে একটি গণতান্ত্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করলেও প্রায় এক যুগেরও অধিককাল রাষ্ট্রটি শাসিত হয়েছে সিভিল মিলিটারী" স্বৈরশাসকের দ্বারা। তবে নব্বই এর দশকে এসে পুনরায় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা ঘটে। এ দশকের প্রথমার্ধেই স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটে জনতার দুর্বার শক্তিতে। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় যাত্রা পথে আমরা মোট চারটি জাতীয় সংসদ পেয়েছি। ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ এর স্থায়ীত্বকাল কম হওয়ায় এর কার্যকারিতার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপিত হয় না। তবে, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্ব বহণ করে থাকে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনীত হয় যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। অপর দিকে সপ্তম জাতীয় সংসদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এ সংসদই প্রথম তার পূর্ণ মেয়াদকাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। যা পূর্বের কোন সংসদের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ৭ম সংসদের মত ৮ম সংসদও তার মেয়াদকালের ৫ বছর পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। এ সংসদের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনী। যদিও এ সংশোধনীর বিরোধীতা করে বিরোধীদল। ৮ম সংসদের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে সংসদের শেষ অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিতি। ৫ম,৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদের ইতিবাচক এসব দিকের পাশাপাশি যে হতাশাব্যঞ্জক চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হচ্ছে বিরোধী দল বিহীন সংসদ পরিচালিত হওয়া। অর্থ্যাৎ বিরোধী দলের অনুপস্থিতির হার ছিল ৪৩%। ৮ম সংসদে প্রধান বিরোধী দল প্রথম ৮মাস সংসদে অনুপস্থিত ছিল। সর্বমোট দেড় বছর বিরোধী দল এ সংসদে অনুপস্থিত ছিল। এছাড়া সরকারি দলের ব্রুট মেজরিটির বহিঃপ্রকাশ এবং স্পীকারের একচোখা নীতির কারণে বিরোধী দল সংসদে সঠিক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তিনটি সংসদেই বিরোধী দল কর্তৃক ঘন ঘন ওয়াক আউটের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে নির্বাচনে পরাজিত দলের ফলাফল না মানার একটি সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। এ সংস্কৃতি ৫ম, ৭ম ও ৮ম সংসদে খুব বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। এসময় বিরোধী দল সংসদের বাইরেই বেশি সক্রিয় ছিল। তারা হরতাল, অবরোধের মত কর্মসূচি পালন করেছে। অধিকাংশ সময় তাদের এই হরতাল, অবরোধ, আন্দোলন রূপ নিয়েছে সহিংসতায় এবং প্রাণহানী ঘটেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ জনগণের।

আলোচ্য গবেষণায় বিরোধী দল রাজনীতিতে বিশেষ করে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে এবং তারা এ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে কী ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এসকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্বিবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে এ গবেষণায়।

গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসেবে আমরা দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। একটি হল Primary Source বা প্রাথমিক উৎস্য এবং অপরটি হল Secondary Source বা মাধ্যমিক উৎস্য। বাংলাদেশে নব্বই পরবর্তী তিনটি সংসদের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের একই ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে এবং তা আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল কী কারণে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে , এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষণায় ব্যবহৃত সমীক্ষায় যে সকল বিষয় উঠে এসেছে তা হলো- পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারী দলের এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রবণতা, সরকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের সদস্যদের অবমূল্যায়ণ করা। স্পীকারের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ এবং সংসদে বিরোধী সদস্যদের সীমিত সুযোগ দান। এছাড়া, বিরোধী দল কর্তৃক অযৌক্তিক ভাবে ঘন ঘন ওয়াক আউট করা, সংসদকে দাবি আদায়ের প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা না করে রাজপথে মিছিল, হরতাল, সমাবেশ করা ইত্যাদি কারণসমূহ সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারীতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এসকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে জনমত জরিপে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সে গুলো হলো- সরকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলকে যথাযথ মূল্যায়ন করা, বিরোধী মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু হওয়া এবং স্পীকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কথা বলেছেন। এছাড়া, অযৌক্তিকভাবে সংসদ বর্জন না করা, হরতাল অবরোধ না দিয়ে সংসদে উপস্থিত থেকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিভিন্ন করণীয় বিষয়সমূহ উঠে এসেছে।

এক কথায়, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ধরণের আইনগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনার পূর্বে সর্বাগ্রে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন তা হল বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
অধ্যায় -১ঃ ভূমিকা	১
১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট	২
১.২. গণতন্ত্রের ধারণা ঃ একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ	৩
১.৩. সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা ঃ একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ	৬
১.৪. বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের ধারণা	৭
১.৫. বিরোধী দল	৭
১.৬. সংসদীয় সরকার ও এর বৈশিষ্ট্য সমূহ	১৪
১.৭. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিরোধী দল	১৭
১. ৮. গবেষণার উদ্দেশ্য	১৮
১.৯. গবেষণার যৌক্তিকতা	১৮
১.১০. অনুমিত সিদ্ধান্ত	১৯
১.১১ .গবেষণার পদ্ধতি	২১
১.১২. গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২১
অধ্যয়- ২ঃ সাহিত্য পর্যালোচনা	২৩-৩৯
অধ্যয়- ৩ঃ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ ও রাজনীতি	৪০
৩.১ বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৪১
৩.২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস	৬১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ ৮২

৩.৪ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের ইতিহাস ৯০

অধ্যায়- ৪ঃ বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও জাতীয় সংসদ ৯২

৪.১. বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ৯৩

৪.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন ৯৪

৪.৩. কমিটি ব্যবস্থাসমূহ ৯৫

অধ্যায়- ৫ঃ সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতা ও বিরোধী দলের ভূমিকা: একটি ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা। ১০২

অধ্যায়-৬ ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ ১১৭

অধ্যায়-৭ ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুণপ্রবর্তন ১২৬

৭.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল ১২৭

৭.২ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল ১৩১

৭.৩. ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল ১৪০

৭.৪. সপ্তম জাতীয় সংসদ ও বিরোধীদল ১৪৫

অধ্যায়-৮ ঃ ৮ম সংসদ ও বিরোধী দল ১৫০

৮.১. ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল ১৫৫

৮.২. ৮ম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৯ ঃ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতায় বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষা পর্যালোচনা (২০০১-২০০৬) ১৬৮

অধ্যায়- ১০ঃ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতায় বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে করণীয় ১৮৭

উপসংহার ১৯০

গ্রন্থতালিকা ১৯২

সংযোজনী ১৯৮

ক. সংসদ বিষয়ক সাংবিধানিক আইন ১৯৯

খ. জাতীয় সংসদ সচিবালয় ২০৮

গ. প্রশ্নমালা ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের তালিকা

পৃষ্ঠা

১. টেবিল-১: প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের ধরণ ১১

২. টেবিল-২: লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের ধরণ ১৩

৩. টেবিল -৩: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও তার কার্যকাল ৯০

৪. টেবিল -৪: বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদ সরকারী ও বিরোধী দলের অবস্থান ৯১

৫. টেবিল-৫: বাংলাদেশের ১ম-৮ম সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদের মেয়াদকাল, মোট অধিবেশন ও মোট কার্যদিবসের সংখ্যা ৯৫

৬. টেবিল-৬: ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১০৬

৭. টেবিল-৭: ১ম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা ১১১

৮. টেবিল-৮: ১ম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান ১১২

৯. টেবিল-৯: ১ম পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান ১১৩

১০. টেবিল-১০: ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল ১১৮

১১. টেবিল-১১: ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১১৯

১২. টেবিল-১২: ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল ১২২

১৩. টেবিল-১৩: ১৯৮৬ সালের ৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১২২

১৪. টেবিল-১৪: ১৯৮৮ সালে ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১২৪

১৫. টেবিল-১৫: ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১২৯

১৬. টেবিল-১৬: Statement of Promises extracted and Implemented (Fifth JS) ১৩৯

১৭. টেবিল-১৭: ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১৪১

১৮. টেবিল-১৮: আওয়ামী লীগের ১ম মন্ত্রীসভা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে) ১৪৩

১৯. টেবিল-১৯: বাংলাদেশের ১ম-৭ম সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদের মেয়াদকাল, মোট অধিবেশন ও মোট কার্য দিবসের পরিসংখ্যান ১৪৫

২০. টেবিল -২০: ৭ম জাতীয় সংসদে ওয়াক আউটের পরিসংখ্যান ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

২১. টেবিল-২১: Statement of Walk outs. ১৪৮

২২. টেবিল-২২: ২০০১ সালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও দফতর সমূহের তালিকা ১৫১

২৩. টেবিল-২৩: লতিফুর রহমানের সময়ে প্রশাসনিক রদবদলের পরিসংখ্যান ১৫৩

২৪. টেবিল-২৪: ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থী ১৫৭

২৫. টেবিল-২৫: ৮ম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১৫৯

২৬. টেবিল-২৬: খালেদা জিয়ার ২য় মন্ত্রীসভা ১৬০

২৭. টেবিল-২৭: ৮ম জাতীয় সংসদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের তালিকা ১৬৫

২৮. টেবিল-২৮: মতামত দান কারীদের বয়স সীমা ১৭০

২৯. টেবিল-২৯: মতামত দান কারীদের শিক্ষাশ্রেণী ১৭১

৩০. টেবিল-৩০: মতামত দানকারীদের পেশা ১৭৩

৩১. টেবিল-৩১: সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত ১৭৪

৩২. টেবিল-৩২: সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায় ১৭৮

৩৩. টেবিল-৩৩: বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি বৈষম্য ১৭৯

৩৪. টেবিল-৩৪: বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গে মতামত ১৮০

৩৫. টেবিল-৩৫: হরতাল বন্ধে আইন করা উচিত কিনা এ সম্পর্কে জনগণের মতামত ১৮১

৩৬. টেবিল-৩৬: সংসদে বিরোধী দল যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা এ সম্পর্কে জনগণের মতামত ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের তালিকা

১. চিত্র-১: বিরোধী দলের প্রকারভেদ ১০

২. চিত্র-২: সংসদীয় কমিটির প্রকারভেদ ৯৯

৩. চিত্র-৩: সংসদীয় কমিটির প্রকারভেদ ১৬৯

৪. চিত্র-৪: মতামত প্রদান কারীদের হার ১৬৯

৫. চিত্র-৫: মতামত দান কারীদের বয়স সীমা ১৭০

৬. চিত্র-৬: মতামত দান কারীদের শিক্ষাশ্রেণী ১৭২

৭. চিত্র-৭: মতামত দানকারীদের পেশা ১৭৩

৮. চিত্র-৮: সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত ১৭৫

৯. চিত্র-৯: ৫ম,৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতিবাচক ভূমিকার কারণ ১৭৬

১০. চিত্র-১০: সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায় ১৭৮

১১. চিত্র-১১: বিরোধী দলের সদস্যরা বৈষম্যর শিকার কিনা ১৮০

১২. চিত্র-১২: বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গে জনগণের মতামত ১৮১

১৩. চিত্র-১৩: হরতাল বন্ধে আইন করা উচিত কিনা এ সম্পর্কে জনগণের মতামত ১৮২

১৪. চিত্র-১৪: রাজনীতিতে বিরোধী দল যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা এ সম্পর্কে জনগণের মতামত ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে আলোচিত প্রত্যয় বা শব্দটি হচ্ছে 'গণতন্ত্র'। সমাজতন্ত্রের পতন এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার ব্যাপক পরিবর্তন গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত্ব করেছে। গত শতকের নব্বই-এর দশকে একমাত্র লাইব্রেরিয়া ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়েছে। তাছাড়া, এতে সামিল হয়েছে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহ। গত দুশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে বিশ্বের প্রায় দু'শ কোটি জনসমষ্টি গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক ব্যাবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ দু'শ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দু'গুণ। ১৯৮৭ সালে ৬৬টি দেশে গণতন্ত্র ছিল। বর্তমানে প্রায় ১০০টিরও বেশি দেশে গণতন্ত্র রয়েছে (আহমেদ এমাজ উদ্দিন: ১৯৯১)।

বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় এ শাসনব্যবস্থার দুটি রূপ বা পদ্ধতি অনুশীলন হয়ে থাকে। এর একটি হচ্ছে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং অপরটি রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যে পদ্ধতিরই হোক না কেন এখানে বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হোক সংসদে বা সংসদের বাইরে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 'দায়িত্বশীল সরকার পদ্ধতি' বলা হয়। আর এ দায়িত্বশীলতা হল সরকারের গঠণমূলক সমালোচনা। কেননা, রাজনীতিতে বিরোধী দলের এ উপস্থিতি এবং গঠণমূলক সমালোচনা সরকারকে জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে "বিকল্প সরকার" বলা হয়ে থাকে।

আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্ব মুলক গণতন্ত্র যেখানে জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন কার্যে অংশগ্রহন করে থাকে। আর এ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো রাজনৈতিক দল। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনসাধারণ তাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার কথা সংসদে জানানোর সুযোগ লাভ করে। এ

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ তখনি কার্যকর হয় অর্থাৎ দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয় যখন এখানে সরকারি ও বিরোধী দল তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যদি গড়িমসি ও অসহযোগ মনোভাব থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণও বিঘ্নিত হয়। ৮ম সংসদকে যদি সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করতে পারা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, আদৌ রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচকমন্ডলীর এবং সকারের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারছে কিনা যা কিনা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মূলমন্ত্র। ৮ম জাতীয় সংসদকে আরও কার্যকর করার জন্য সরকারী ও বিরোধী দল কীভাবে ভূমিকা রাখছে, তাদের কার্যপদ্ধতি কতটুকু গণতান্ত্রিক ও দেশের জন্য কল্যাণকর এবং কীভাবেই তারা সংসদকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারতো তার মানসেই এ গবেষণা।

১.২ গণতন্ত্রের ধারণা ঃ একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হতে জানা যায় যে, সুদূর অতীতে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। মহাভারতে গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিক যুগে এবং গৌতম বুদ্ধের সময় গণতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হতে জানা যায় প্রাচীন ভারতে কয়েকটি স্থানে গণতন্ত্র প্রর্বর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের ন্যায় প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও গণতান্ত্রিক ধারনার উদ্ভব ঘটেছিল। পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে গ্রীকগণ 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে । প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও জনগণ গণতন্ত্র বলতে বহুজনের শাসনকে বুঝাত। গ্রীস ও রোমের নগর রাস্ট্রসমূহে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কারণ, এদের আয়তন ছিল ক্ষুদ্র, জনসংখ্যা ছিল অনেক কম এবং রাজনৈতিক সমস্যাদিও ছিল না তেমন জটিল প্রকৃতির। তখন নাগরিকগণ কোন এক স্থানে মিলিত হয়ে রাস্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করত। অবশ্য ক্রীতদাস ও স্ত্রীলোকগণ রাস্ট্রীয় শাসনকার্যে অংশগ্রহনের সুযোগ হতে বঞ্চিত ছিল । সেই যুগে গণতন্ত্রের এ ধারণাটিও যে ছিল যথেষ্ট বৈপ্লবিক তা বলাই বাহুল্য। অতঃপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে গণতন্ত্রের সন্ধান মিলে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হতে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিশ্বের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের সঙ্গে সকলেই কম বেশি পরিচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট নয়। গণতন্ত্রকে বিভিন্ন লেখক ও চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারো মতে, গণতন্ত্র এক প্রকার সরকার ব্যবস্থা, এক প্রকার সমাজ ব্যবস্থা এবং এক প্রকার জীবন পদ্ধতি। আবার কারো মতে, গণতন্ত্র কোন প্রকার সরকার ব্যবস্থা নয় বরং শাসনকার্য পরিচালনার একটি উত্তম পদ্ধতি মাত্র। সহজ কথায় আমরা বলতে পারি যে, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে যাতে জনগণ অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারে , তা নিশ্চিত করতে যে প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় তাই গণতন্ত্র। অধ্যাপক R.M. Maclver বলেন, "Democracy is not a way of governing, whether by majority or otherwise but primarily a way of determining who shall govern and , broadly to what ends" (Maclver, R. M. : 1926) । আবার, লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর 'Modern Democracies' নামক গ্রন্থে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ''Democracy is that form of government in which the ruling of a state is legally vested, not in any particular class or classes, but in the members of the community as a whole". (Bryce Lord: 1972) আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের (Abrahan Lincoln) মতে, ''Democracy is a government of the people, for the people and by the people''. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা মোটেই অযৌক্তিক হবে না যে, গণতন্ত্র হচ্ছে মূলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে গঠিত ও পরিচালিত সরকার। কিন্তু তাই বলে এটা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত এবং স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে না। গণতন্ত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। এটা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিটি ব্যক্তি সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত ঃ জনগণ এবং তাদের মতামতই গণতন্ত্রের প্রাণ।

এবার আমরা গণত্রের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রকে উদারনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক এ দুই শ্রেনীতে ভাগ করতে পারি। আবার এটাকে প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

এবং পরোক্ষ এ দুই শ্রেনীতে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র মূলতঃ উদারনৈতিক দর্শন ও ভাবধারারই প্রতিফলন। এর পিছনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং হিতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দু'টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জনগণকে তাদের বিভিন্ন অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংঘ গঠন অধিকার প্রদান করে। ধণতান্ত্রিক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনগণের যাবতীয় অধিকার আনুষ্ঠানিকভঅবে ঘোষিত হলেও তারা এ সকল অধিকার ভোগ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্রে জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমূহ কেবল ঘোষিতই হয় না, ঐগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এভাবে সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং কিউবাসহ বিভিন্ন্য রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রবর্তিত আছে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আবার দু'টি ভিন্নরূপ রয়েছে । এগুলো হল- প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে সে শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে জনগণ নিজেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। এতে জনগণ এক গণসভায় মিলিত হয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করে থাকে। এভাবে মিলিত হয়ে তারা আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রগুলোতে এভাবে জনগণ একটি গণসভায় মিলিত হতো। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক এবং স্বাধীন নাগরিক গণসভার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত। তবে এতে মহিলা, মজুর এবং ক্রীতদাসদের অংশগ্রহণের কোন প্রকার সুযোগ ছিল না। শুধুমাত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমেই নয় আধুনিককালেও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সুইজারল্যান্ডের ক্যান্টনসমূহ আজও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শাসিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র একমাত্র সেসকল রাষ্ট্রেই থাকতে পারে যেগুলোর আয়তন ক্ষুদ্র, জনসংখ্যা স্বল্প এবং সমস্যাদি অপেক্ষাকৃত জটিল নয়। আধুনিক বৃহদায়তন ও সমস্যাসঙ্কুল জাতীয় রাষ্ট্রে পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

একে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে তাই আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্রের একটি বিশেষ ত্রুটি এই যে, জনপ্রতিনিধিরা একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা জনমতবিরোধী কাজও করতে পারে। তবে এ ব্যবস্থা যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য পরোক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। এ নিয়ন্ত্রণগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-গণভোট, গণউদ্যোগ এবং পদচ্যুতি।

১.৩. সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণাঃ একটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণ

বর্তমান বিশ্বে সংসদীয় গণতন্ত্রকে শাসনপদ্ধতি হিসেবে সর্বোত্তম পদ্ধতি বলে বিবেচনা করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিরোধী দল সরকারী দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর নজরদারী রাখেন। একারণে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে 'ছায়া সরকার' বলা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বজায় রাখা সহজতর। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীগণ একাধারে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান এবং আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য উপাদান। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ ব্যবস্থায় সরকারকে প্রতিনিয়ত জনগণের পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ সত্যিকার অর্থে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যবস্থাধীনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন সরকার গঠন করে তখন সংখ্যালঘু দল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে। বিরোধী দল সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে তাই বিরোধী দলের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যেকোন সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার তুলনামূলকভাবে সুপরিবর্তনীয় ও গতিশীল। Walter Bagehot বলেন , সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণ সময় উপযোগী শাসক নির্বাচন করে জাতির সংকট মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । তাছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ভোটের অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ , স্ত্রী- পুরুষ, ধনী নির্ধণ নির্বিশেষে সকলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকে।

১.৪. বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের ধারণাঃ

Dr. Garner বলেছেন যে, "Parliamentary Government is that system in which the cabinet is immediately and legally responsible to parliament" (Garner :1955) । ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বাঙ্গালিরা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাথে পরিচিত থাকলেও পাকিস্তানি শাসনামলে তা কখনো বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়। এই নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় বাঙ্গালিরা অনেক সংগ্রাম করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালিরা রক্ত ঝরিয়েছে শুধুমাত্র শাসনকার্যে সার্বিক অংশ্রগহণের জন্য। দীর্ঘ ২৪ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার স্বপ্নে বিভোর হয়। যদিও ১৯৭১ সালে গণপরিষদ গঠন করা হয় এবং এটার মূল লক্ষ্য ছিল সংবিধান প্রণয়ন। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আপোষহীন। অর্থ্যাৎ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বেই প্রথমে বাংলাদেশের মাটিতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় এবং আওয়ামীলীগের নেতৃত্বেই ১৯৭৫ সালে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে বর্তমানে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু থাকলেও এর প্রতিবন্ধকতা কম নয়।

১.৫ বিরোধী দল

মানব প্রকৃতির এক অন্যতম অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজ আদর্শ মতবাদ বা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠাকরণ। ফলে সমাজে পরস্পর বিরোধী একাধিক মত বা আদর্শের উপস্থিতি লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। হেগেল এবং কার্লমার্ক্স এর মতে যে কোন বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের বা এন্টিথিসিসের ফলে জন্ম নেয় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার বা এক নতুন থিসিসের বা "সম্বাদের"। মানব সমাজের এ চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান শাসন কর্তৃপক্ষের বিপরীতে বিরোধী মত বা আদর্শের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিরোধী বা "Opposition" শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Opposition" হতে যা অর্থ হচ্ছে বিরোধীতা করা। ব্রিটিশ সরকারকে যেমন Her Majesty's Government বলা হয় তেমনি বিরোধী দলও Her Majesty's opposition। John Hobhouse, ১৮২৬ সালে প্রথম His Majesty's Opposition বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন। "In democratic countries the opposition is a means of popular sovereignty as vital and important as the government and to suppress the opposition is to negate the sovereignty of the masses"(Lindsay A.D: 1978). "The opposition is driven to a party that is out of power and that exists mainly for the purpose of criticizing the party in power and if possible spplanting it". (Encyclopedia Grolier, 1958). Dictionary of American Politics এ বলা হয়েছে: "In the context of parliamentary system it mentions that opposition includes the Political party who either singly on collectively oppose the party in office" (Dictionary of American Politics: 1968). Robert A Dahl লিখেছেন যে, 'But as observed legal, orderly and peaceful mode of Political oppositions are rare throughtout the recorded history." (Dahl, Robert A. : 1966)

গণতন্ত্রের ধারণার বিকাশের সাথে সাথে বিরোধী দলের সাংগঠনিক এবং সাংবিধানিক ধারণাটিও বিকাশ লাভ করেছে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে বলা হয় বিকল্প সরকার এবং বিরোধী দলই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে বিকল্প নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। তাই Earnest Barker বিরোধী দলকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার Safety value বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিরোধী মতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। যেমন- সমাজ তান্ত্রিক একনায়ক তান্ত্রিক, বা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী মত, আদর্শ বা বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ আস্থা লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্রকে বলা হয়ে থাকে সমালোচনা বা আলোচনার আলোকে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ভিন্নমত এবং সমালোচনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়না বরং গণতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য এর প্রয়োজন। গণতন্ত্র এবং বিরোধী দলের পারস্পরিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Robert. Dahl A., বলেন-".....we take the absence of an opposition party as evidence if not always conclusive proof for the absence of democracy" (Dhal Robert A: 1966)

গণতন্ত্রের ধারণার বিকাশের সাথে সাথে বিরোধী দলের সাংগঠনিক এবং সাংবিধানিক ধারণাটিও বিকাশ লাভ করেছে। কেননা গণতন্ত্র কেবল মাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং কথা বলারই স্বাধীনতা দেয় না পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। গণতন্ত্রে যত বেশী ভিন্ন মতকে স্থান করে দেওয়া হয়, তা তত বেশী মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ্যাৎ বিরোধী দলের সুসংগঠিত উপস্থিতি রাষ্ট্রে বিদ্যমান শাসন কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছাচারীতা ও যথেচ্ছামূলক আচরণ হতে বিরত রাখে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিরোধী দল সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে বিকল্প নেতৃত্বের সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

Political Opposition in Western Democracies গ্রন্থে Robert Dahl A বিরোধী দলকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন ।

চিত্র-১: বিরোধী দলের প্রকারভেদ

Robert Dahl. A. সাংগঠনিক দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে বিরোধী দলকে চার ভাগে ভাগ করেছেন ।

ক) দ্বী- দলীয় ব্যবস্থা যেখানে দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দৃঢ় দলীয় ঐক্য বিদ্যমান, যেমনঃ গ্রেটবিটেন

খ) দ্বী- দলীয় ব্যবস্থায় দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বা সংহতি সুদৃঢ় নয়

গ) বহুদলীয় ব্যবস্থায় দৃঢ় দলীয় ঐক্য বিদ্যমান । যেমনঃ সুইডেন, নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ড

ঘ) নিম্ন দলীয় সংহতি বর্তমান যেমনঃ সুইডেন এবং ফ্রান্স

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতা বলতে নির্বাচনে এবং আইনসভার বিরোধী দলসমূহ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কতটুকু অর্জন করছে বা হারাচ্ছে তা বোঝায়। বহুদলীয় ব্যবস্থায় দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলেও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দুটি দলের মধ্যে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান থাকে।

Type of System	Election	Parliament	Example
1. Strictly	Strictly	Strictly	Britain
Competitive	Competitive	Competitive	
и. Competitive			
Competitive			
A. Two party	Strictly Competitive	Cooperative and Competitive	United states
B. Multi- party	Cooperative and Competitive	Cooperative and Competitive	France, Italy
Coalescent			
Competitive			
A. Two party	Strictly Competitive	Coalescent Coaleseent	Austria
Strictly	Coalescent	Coaleseent	Colombia
Coalescent			

টেবিল-১: প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের ধরন

বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ সর্বদা সরকারের নীতি বা কার্যক্রম সমূহে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট থাকে আর এ লক্ষ্যে তারা সরকারকে বিভিন্ন উপায় প্ররোচিত ও প্রভাবিত করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

"The situation circumstance in which an opposition employ its resources to bring about a change might called a site for encounters between opposition and government" (Hasanuzzamzn, Al Masud: 1998)

বিরোধী দল নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে কখনো যৌথ বা Coalition সরকারে যোগদান করে আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করে আবার কখনো বিভিন্ন চাপ সৃষ্টি কারী গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের লক্ষ্য বা নীতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় । আর সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে তারা তাদের লক্ষ্যে উপনীত হয়।

যুক্তরাজ্যের ন্যায় দ্বী-দলীয় ব্যবস্থায় যেখানে দুইটি রাজনৈতিক দল ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় আসে সেখানে বিরোধী দলের মূল লক্ষ্য থাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং দলীয় নীতি বা কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করা। যেহেতু পার্লামান্টে তাদের পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিদ্যমান থাকে সেহেতু খুব সহজেই দলীয় নীতিসমূহকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে যারা বিরোধী দলে অবস্থান করেন তারা জনমত গঠনের ভিত্তিতে পরবর্তী নির্বাচনে জয় লাভের জন্য সচেষ্ট হন। ইতালী, হল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া প্রমূখ ব্যবস্থায় সেখানে সরকার গঠিত হয় সমঝোতার ভিত্তিতে বা যাকে বলা হয় যৌথ সরকার সে সকল ব্যবস্থায় বিরোধী দলসমূহ সরকার গঠনে যোগদান করে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়। বিরোধী দলসমূহ সর্বদা তাদের লক্ষ্যের ভিত্তিতে পৃথক হয়ে থাকে। বিরোধী দলের লক্ষ্য বলতে তাদের সে সকল উদ্দেশ্যকে বোঝায় যে উদ্দেশ্যসমূহে পৌছানের জন্য তারা সরকারের নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হয়।

	Personnel	Specific policies of govt.	political structure	Socio Economic Structure	
Nonstructural			-	-	

Dhaka University Institutional Repository

opposition					
1.Pure office seeking parties	+	-	-	-	U.S fedarelists
2. Pressure group	-	+	-	-	U.S Farm Burean Fedaruthi
3. Policy orente parties Limited opposition	+	+	-	-	U.S Republican party
4. Political reformism(not +or policy oriented)	-	+	+	-	Britain Irish Nationalist
Major Structural opposition 5. Comprehensive political Structural reformism	+	+	+	+	France: RPf
6. Revolutionary monements symbols: yes=no	+	+	+	+	Communi st parties

টেবিল-২: লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের ধরণ

Dhaka University Institutional Repository

Robert A. Dahl তার গ্রন্থ Opposition in Western Democracies এ বলেছেন যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের বিরোধী দল ও উন্নয়নশীল বিশ্বের বিরোধী দলকে একই ছাঁচে ফেলা বা অর্ন্তভূক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, উন্নয়নশীল বিশ্বে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিরোধী রাজনৈতিক দলের আর্বিভাব ঘটে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক দলসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে উঠে ব্যক্তির ইমেজকে কেন্দ্র করে। এখানে দলীয় আর্দশের তুলনায় পরিবার কেন্দ্রিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া , সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের অভাব এবং দল ভাঙ্গনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-"The major hindrances which prevent the opposition from playing a more effective role are the inclination to look for avenues of power" (Hasanuzzaman, Al Masud: 1998) । তাছাড়া, শক্তিশালী সু-শীল সমাজের অনুপস্থিতি, সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমলাতন্ত্রের অতি বিকাশ এবং সামরিক বাহিনীর রাজনীতিকীকরণ উন্নয়নশীল বিশ্বের বিরোধী দলের বিকাশকে অনেকাংশে সীমিত করে ফেলে।

১.৬ সংসদীয় সরকার ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

Gettel, R.G. বলেন Cabinet Government is that system in which the real executive-the cabinat or ministry is immediately and legally responsible to the legislature or branch of it for its political Policies and act, and immediately or ultimately, responsible to the electorate, while the titular or nominal executive the chief or state occupies a position of irrespossibility." (Gettel, R.G: 1910)। সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রি পরিষদ শাসিত সরকার বা দায়িত্বশীল সরকার বলতে সে শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রি পরিষদ থাকে এবং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ তাদের রাজনৈতিক কাজ কর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। Gettell এর মতে "Cabinet government is that form in which the real

Dhaka University Institutional Repository

executive, consisting of a prime minister and cabinet, is legally responsible to the legislature for its activities (Gettel, R.G.: 1910) ।Sir Ivor Jennings এর মতে "The cabinet is responsible for all the activities of the government, whether settled by civil servants, by ministers or by the cabinet itself" (Jennings S.I.:1961) । D. A Giizling এর মতে "Parliamentary government is that form of government in which the executive is drawn from and is constitutionally responsible to the legislature". (Giizling, D. A.:1978) । সুতরাং সংসদীয় সরকার বলতে এমন এক শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ দেশ পরিচালনা করবে,আইন পরিষদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ দেশ পরিচালনা করে, মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে, মারা গেলে বা শারীরিক ভাবে অসমর্থ হলে সরকার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কতিপয় স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যর হয়ে থাকে। সেগুলো হলো-

১. সংসদীয় সরকারে শাসন বিভাগকে আনুষ্ঠানিক, আলংকরিক বা সাংবিধানিক এবং প্রকৃত বা কার্যকরী শাসন বিভাগে ভাগ করা হয়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান নামে মাত্র এবং উপাধি সর্বস্ব নির্বাহীকর্তা। সকল ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে তার হাতে ন্যস্ত থাকে এবং প্রশাসন তার নামেই পরিচালিত হয় কিন্তু বাস্তবে তিনি কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না।

২. আইন সভার জনপ্রিয় পরিষদের যে দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে সে দল মন্ত্রিসভা গঠন করে । সেই দলের নির্বাচিত নেতাই প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলরের পদ গ্রহন করেন। অনেক সময় একাধিক ক্রমে শাসনতন্ত্রের প্রধান অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। অনেক সময় একাধিক দল একত্রিত হয়েও যৌথ সরকার বা কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। কোয়ালিশন নেতাই সরকারের কার্যকরী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংসদীয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো সরকারী নীতি ও শাসন পরিচালনায় আইনসভার কাছে নির্বাহী বিভাগের তথা মন্ত্রীসভার দায়বদ্ধতা। মুলত আইনসভা বা পার্লামেন্টের কাছে নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতার জন্যেই সংসদীয় সরকারকে সাধারণভাবে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়ে থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এ দায়িত্বশীলতা দ্বিবিধঃ(ক) ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা এবং(খ) যৌথ দায়িত্বশীলতা। সাধারণত প্রত্যেক মন্ত্রীই কোন না কোন বিভাগের দায়িত্বে থাকেন। প্রত্যেক বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজ বিভাগের কাজকর্মের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। যদিও অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের কাজ কর্মের অনেক বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার স্থায়ী সরকারী কর্মকর্তাদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু পর্লামেন্টে নিজ বিভাগের সম্পাদিত কাজকর্মের ভুলত্রুটির দায় দায়িত্ব মন্ত্রী বা সরকারী কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে অব্যহতি পেতে পারেন না।

যৌথ দায়িত্ব বলতে বোঝায় সমস্ত সরকারী নীতি, সিদ্ধান্ত ও সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য আইনসভার কাছে মন্ত্রীদেরকে সামষ্টিক ভাবে দায়বদ্ধ থাকা। সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের সবাইকে ক্যাবিনেটের কিংবা মন্ত্রীসভার সামষ্টিক সিদ্ধান্তের দায় দায়িত্ব বহন করতে হয়। এ মতবাদনুসারে মন্ত্রীসভার সকল সদস্যদের সমস্ত নীতির জন্যে দায়ী করা হয়। কোন মন্ত্রী কোন অজুহাতেই এ দায়িত্ব থেকে নিস্কৃতি পেতে পারেন না। মন্ত্রিসভা শাসিত সরকারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব। তিনি হলেন মন্ত্রীসভার কেন্দ্রমনি। প্রধানমন্ত্রী যতদিন স্বপদে আসীন থাকেন ততদিন মন্ত্রীসভাও বাজায় থাকে।

৪. এরূপ শাসন ব্যবস্থায় এমন একজন উপাধি সর্বস্ব রাষ্ট্র প্রধান থাকেন যার হাতে সকল ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তার এই সকল ক্ষমতা সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীগণ কর্তৃক তার নামেই বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় এরূপ নামে মাত্র প্রধানের যদিও প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকে না তবুও রাষ্ট্রের সংকট কালীন মুহূর্তে অথবা কোন কোন রাষ্ট্রের এরূপ প্রধান জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেন। Walter Bagehot বলেন– "The king has three rights-the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn" (Bagehot W: 1961)

Dhaka University Institutional Repository

৫. সংসদ নির্বাচনে কোন দল বা কোয়ালিশনের সুস্পষ্টভাবে স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতার পক্ষে অপরিহার্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন ভোগকারী নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে দলীয় সরকারকেই বোঝায়। দল একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এবং সুশৃঙ্খল নেতাগণের সুসংহত নেতৃত্বাধীনে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রীসভার পতন ক্ষমতাশীল দলেরই পতন। দ্রুত সরকারের পতন রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পক্ষে হুমকি স্বরূপ হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল বা কোয়ালিশনকে অভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গির অনুসারী হতে হবে।

৬. Sir Lvor Jennings বিরোধী দলের অস্তিত্বকে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করেন। এরূপ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং নির্বাহী ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচার রোধকল্পে শক্তিশালী ও কার্যকর বিরোধী দল থাকা অপরিহার্য (Jennings S.I.: 1961) ।

১.৭ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও বিরোধী দলঃ

যে কোন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দল এক অনবদ্য ভূমিকা পালনে ব্রত হয়। কারন, সারকারি দলের একমূখী নীতিসমূহ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে সেটা জনকল্যাণমূখী করার প্রয়াস চালায় বিরোধী দল। সরকারি দলের আলোচনা সমালোচনা করে তাদেরকে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় ধাবিত করা সম্ভব। উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সংসদীয় সরকার এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।। Earnest Barker এর মতে " A cabinet is strengthened rather than weakened by the existence of an organized opposition and thus the requirement for ready provision of leadership is mostly satisfied when there is a coherent group of alternative leaders, well prepared to supply an alternative guidance (Barker, Earnest, 1958) ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ গবেষণার উদ্দেশ্য

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে বিরোধী দল। এবং বিরোধী দলকে এ ব্যবস্থায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কেননা বিরোধী দল ব্যতীত সংসদীয় গণতন্ত্রের যে মূল দর্শন "সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা" তা কখনোই অর্জন করা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, সরকারের কাজের সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনার মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারকে সচেতন এবং দায়িত্বশীল করে তোলে। এভাবে সরকারের কার্যাবলী পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বিরোধী দল এক অর্থে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে এবং রাজনীতিতে রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা কতটুকু স্পষ্ট এবং কার্যকরী তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণায় বিরোধী দল রাজনতীতিতে বিশেষ করে সংসদে এবং সংসদের বাইরে কি ভূমিকা পালন করছে এবং তারা এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে কিনা, তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে তার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ৮ম জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে বিরোধী দল কী ভূমিকা রেখেছে এবং কী ভূমিকা রাখতে পারত সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

১.৯ গবেষণার যৌক্তিকতা

"গণতন্ত্র"-শব্দটি বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। অভিভক্ত ভারত বর্ষে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার যে স্বপ্ন লালন করে আসছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র তা অর্জিত হয়নি। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসন কর্তৃপক্ষের আধিপত্য এবং রাজনীতিতে "সিভিল মিলিটারী" আমলাদের উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও তার অস্তিত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধণীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা এবং একদলীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ৭৫ এর পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘ ষোল বছরেরও বেশী সময় বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে স্বৈর শাসকদের দ্বারা যেখানে বিরোধী দলের কোন অবস্থানই পরিলক্ষিত হয়নি।

নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। গত এক যুগেরও কিছু বেশী সময় ধরে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করেছি। এর মধ্যে পেয়েছি ঐক্যমতের সরকার (১৯৯৬) এবং জোট সরকার (২০০১)। কিন্তু কোন কার্যকর সংসদ পাইনি। বিরোধীদলের সংসদ বয়কট এবং সরকারি দলের অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণে সংসদ সর্বদাই অকার্যকর থেকে গেছে । সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির ফলে একদিকে যেমন মন্ত্রীদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা হ্রাস পেয়েছে তেমনি অপরদিকে সংসদ সরকারের নীতি বাস্তবায়নের একটি "রাবার-স্ট্যাম্পে' পরিণত হয়েছে। সংসদের বাইরেও বিরোধী দল রাখেনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। বাংলাদেশে গত এক দশক যাবৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা প্রকৃত সংসদীয় ব্যবস্থা হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এ ক্ষেত্রে সংসদকে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বিরোধী দলের ভূমিকার উপর গবেষণা পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। জনগণের ভোটের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য বিরোধী এবং সরকারী উভয় দলকেই সংসদকে তাদের রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে আলোচ্য গবেষণা কার্যটি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১.১০ অনুমিত সিদ্ধান্ত

যেকোন গবেষণার ক্ষেত্রে অনুমান একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কেননা, সঠিক অনুমানের ওপরই নির্ভর করে সফলতা। আমি আমার গবেষণার শিরোনাম সম্পর্কে যে অনুমান করতে পারি তাহলো আমাদের দুর্বল রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভোট ব্যবস্থা, অস্বচ্ছ নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা, বিদেশিদের প্রভাব এবং জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণের অপ্রতুলতা প্রভৃতি এদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা অনেকাংশে খর্ব করেছে। যেকোন

Dhaka University Institutional Repository

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম ও আচরণ এবং আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায় এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি ততটুকু উন্নত নয়। এখনকার নির্বাচন ব্যবস্থায় ব্যক্তির চেয়ে দলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থায় কারচুপি, পেশিশক্তির ব্যবহার, আত্মীয় ও দলীয় বিবেচনায় ভোট হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জাতীয় সংসদের মহিলাদের দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়ার কারণে তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। সরাসরি মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের ব্যবস্থার অভাবে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো সফলতা আসছে না এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মানও উন্নত হচ্ছে না।

তাছাড়া এদেশে রাজনৈতিক সংগঠনে দ্রুত ভাঙ্গন, বিরোধী দল থেকে সরকারি দলে প্রবেশ, একদল থেকে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগদান সচরাচর চোখে পড়ে। এ সবই দুর্বল ও অপরিণত রাজনৈতিক কৃষ্টির পরিচায়ক যা দেশের জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটায় না। যার ফলে দেশে জনগণের মতামতের প্রতিফলন বেশি ঘটে না এবং সংসদে বিরোধী দল যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

অতএব, আমরা ধরে নিচ্ছি যে বিগত বছরগুলোতে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে বিরোধী দলসমূহ যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষা করতে অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি সফল হয়নি। ফলে দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন গতিশীলতা পায়নি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করার মতো ধৈর্য্য ও পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেনি। আর বিরোধী দলসমূহের বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা অপ্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেছে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টহীন ইস্যুতে বিরোধী দলসমূহের এরূপ বিরোধিতা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

১.১১ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষনাটি Primary ও Secondary তথ্যনির্ভর । প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষণাা এলাকার ১০০ জন নাগরিকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই নাগরিকদের মধ্যে বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীও রয়েছে।। দ্বিতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক তথ্যের জন্য বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র কীভাবে কার্যকরী হতে পারে এবং বিরোধী দল কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখতে পারে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিভিন্ন বই , জার্নাল , পত্র পত্রিকা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.১২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সামাজিক বিজ্ঞানের যেকোন গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে গেলেই কিছু কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়। যেকোন গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো অর্থ বরাদ্দ না রাখায় চরম ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিষয়টির ওপর ব্যাপক অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। সীমিত সময়, অর্থ ও লোকবলের অভাবে নমুনার আকার বড় করা সম্ভব হয়নি। তবে সঠিক নমুনায়নের মাধ্যমে ত্রুটি কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সীমিত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে টুকিটাকি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রশ্নমালা পূরণের ক্ষেত্রে অনেক উত্তরদাতা যাদেরকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারা সঠিকভাবে মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে। বিরাজমান সমস্যা থাকা সত্ত্বেও নবীন গবেষক হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কিছু একটা উপস্থাপন করা গেলে এটা গবেষকের আন্তরিকতারই ফসল। তবে যাইহোক, গবেষণার সীমাবদ্ধতগুলো নির্দিষ্টভাবে নিম্ন তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১. গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ফলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গবেষণাটি কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

২. সাক্ষাতকার গ্রহণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন বহিঃস্থ উপাদান সাক্ষাতকারের অনুকূল পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে।

৩. সীমিত সময়ে শিক্ষানবীশ গবেষকের স্বল্পজ্ঞান ও দক্ষতা, অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গবেষণা কার্যটি যথেষ্ট মানসম্মত করা সম্ভব হয়নি।

৪. উত্তরদাতারা বিভিন্ন কোয়ালিটির হওয়ায় সাক্ষাতকার গ্রহণের সময় উত্তরদানের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও পক্ষপাত দুষ্টতার প্রশ্নটি এড়ানো সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, গবেষণা করতে গেলে বিশেষ করে সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। একটি গবেষণা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত ও সকল দিক থেকে অনুকূল হবে এমন কোন কথা নেই। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যথা সম্ভব আন্তরিক ও ত্রুটিমুক্তভাবে গবেষণাটি পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে গবেষকের অন্তরায়সমূহ গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করবে না বলে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় -২
সাহিত্য পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

বিগত কয়েক দশক ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের মনোযোগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি প্রমানিত হয়, বিভিন্ন দেশের সরকার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে। কারণ অনেক দেশই সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রনয়নে উদ্ভুদ্ধ হয়েছে। এক কেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্টীয় শাসন সমানভাবে জনপ্রিয়। আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতার ভিত্তিতে এরকম শাসন ব্যবস্থার জনকল্যানকর নীতি গুলোকে বাস্তবে রুপায়িত করা সম্ভব হয়। তাই সংসদীয় সরকারের প্রতি ক্রমবর্তমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারী দল ও বিরোধীদলের রয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংসদীয় ব্যবসস্থায় সরকারী দলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রধান মন্ত্রীর অবস্থান। প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করার জন্য রয়েছে কেবিনেট। প্রধান মন্ত্রীর গঠনমূলক নেতৃত্ব এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকার উপর সংসদীয় সরকারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুযোগ্য নেতৃত্বই হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রী পরিষদের উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতা সূচিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর গুণগত যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুনাবলীর উপর মন্ত্রী পরিষদের প্রশাসনিক সাফল্য নির্ভরশীল। আবার মন্ত্রীদের ও দেশের নেতা হিসাবে সচ্চরিত্র, দুরদর্শী, আদর্শনিষ্ঠা ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক দৃঢ়তা জনসাধারনের মনে উদ্যম ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। Jennings মনে করেন, "The Prime Ministers Power in office depends in part on his personality in part on his personal prestige and in part upon his party support." (Jemings: 1961) । প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে Moode বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি একক ভাবে শাসন পরিচালনায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাজশক্তির প্রধান উপদেষ্টা, রাজশক্তির প্রধান, উত্তরাধিকারী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং সরকারের প্রধান।" সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের রয়েছে Collective responsibility। কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে কোন একজনের ব্যর্থতা সমগ্র কেবিনেটের ব্যর্থতা বলে মনে করা হয়। এসম্পর্কে Hervey and Bather লিখেছেন ঃ- "The Cabinet stands or all together. Where the policy of a particular minister is under attack, it is the government as

Dhaka University Institutional Repository

a whole which is being attacked. Thus the defeat of a minister on any major issue represents defeat of government." (Hervey and Bather:1973).

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Sir Jennings বিরোধীদলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন- তাৎক্ষনিকভাবে বিরোধীদল সরকারের বিকল্প এবং গণ অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের মতই গুরুত্ববহ। বিরোধীদল না থাকলে গণতন্ত্র হয় না। মহামান্য রানীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারী দলের মতই (Jennings S. I: 1961) । আবার সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হবে না যদি "বিরোধীদল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনকে মেনে নিতে না পারে।" (Jennings S. I: 1961) । বস্তুত পক্ষে "বিরোধীদল এবং সরকার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র । সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। পারস্পারিক সহনশীলতা না থাকলে সংসদীয় সরকার প্রক্রিয়া ভেঙ্গে যায়" (Jennings: 1961) । বিরোধী দলের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে Harold Laski বলেছেন, "The opposition spends its time in revealing the defeats of the government programe," (Laski Harold J: 1932)। বিরোধীদলের সমালোচনার তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোতে রক্ষণশীল দল (Conservative party) এবং শ্রমিক দলের (Labour party) ঐক্যমত্য রয়েছে বলেই ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়াও যে বিষয়ের উপর Jennings গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো, "The prime Ministers meets the Convenience of the opposition and the leader of the opposition meets the convenience of the Government." (Jennings S. I: 1961)।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় ব্যবস্থাকে সাফল্যমন্ডিত করতে প্রধানমন্ত্রী, কেবিনেট ও বিরোধীদলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। আর এই ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধীদলের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির গুরুত্ব অপরিহার্য। অপরিহার্য বলেই সংসদীয় ব্যবস্থার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত বৃটেনে কমিটি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করেছে। কমিটিসমূহকে বাদ দিয়ে সেখানকার পার্লামেন্টে আইন প্রনয়নের বিষয় অচিন্তনীয়। Woodrew Wilson তার কমিটি গুলোকে Little Legislature এবং এর চেয়ারম্যান বৃন্দকে Petty barons বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ্রেট বৃটেনের অনুকরনে ভারতের মত সংসদীয় ব্যবস্থার দেশে কমিটি গড়ে উঠেছে। পার্লামেন্টের দুটি সভার সদস্যসংখ্যা অত্যোধিক হওয়াতে কোন বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনা এতে সম্ভব হয় না। খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষন করার জন্যই পার্লামেন্ট বিভিন্ন বিষয়ের কমিটি গঠন করেছে। বর্তমানে ভারতে সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি, আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি প্রভৃতির মত আরও স্থায়ী কমিটি এবং কিছু সংখ্যক অস্থায়ী কমিটির মাধ্যমে পার্লামেন্টারী কাজ গুলো সম্পাদিত হচ্ছে। ইংল্যান্ড এবং ভারতের তুলনায় আমাদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এখনও সূচনা পর্বেই রয়ে গেছে। অথচ সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কমিটি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। কারণ. ক) স্বল্প সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কমিটিগুলো আইনের খসড়া প্রস্তাবগুলো অনেক সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন। এখানে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সাংসদরা তাদের মেধা, প্রজ্ঞা প্রয়োগের সুযোগ পান ফলে উৎকৃষ্ট আইন প্রণীত হয়। খ) কমিটি গুলোতো বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে, ফলে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগীতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের সবাইকে ক্যাবিনেটের কিংবা মন্ত্রীসভার সম্পর্কে সিদ্ধান্তের দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়। একথা ঠিক যে সরকারের নীতিনির্ধারন বা সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় ক্যবিনেটের সদস্যদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে। R.C Agarwal এই বিষয়টি সম্পর্কে বলেন- "A parliamentary government is also called responsible or cabinet form of government, because the cabinet enjoys the real powers of the government and it is Under the central of parliament." (Agarwal; 2003) |

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের অধিকাংশ দেশই যখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চর্চা নিয়ে ব্যস্ত তখন বাংলাদেশও এ থেকে পিছিয়ে থাকেনি। এ প্রসঙ্গে রুন্তনক জাহান বলেন- "Bangladesh began with a parliamentary model of government and polities and in the first three years of this new nalians existence, the parliamentarians emerged as the most influenltial members of the political Elite. "(Jahan Rounaq: 1980) । বাংলাদেশ তার জন্মের প্রথম থেকেই সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা করলেও বিভিন্ন কাল পরিক্রমায় বাংলাদেশ প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা শুরু করে ১৯৯১ সাল থেকে। এখানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থাও চালু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন- A supporter of the presidential form of government, Khaleda Zia dragged her feet on the issue, but ultimately decided for a parliamentary system. The Jatiya Sangsad voted unanimously for the introduction of a parliamentary system on the night of August 6-7, 1991 and Khaleda Zia took oath of office as Prime minister under the amended constitution on September 19, 1991. (Maniruzzaman, Talukder: 1994)

গণতন্ত্র শাসন কাঠামোতে জনগনের প্রতিনিধিত্বের কথা বলে, শাসিতের কাছে শাসকবর্গকে দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ রাখতে চায়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে M.M. Awal Hossain বলেন- "Democracy is a continuous political process, which can only be sustained and developed by giving due attention to passed 34 years of its independence, it has failed to establish democracy as an institution. (Hossain Awal MH: 2003. সংসদীয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো সরকারী নীতি ও শাসন পরিচালনায় আইন সভার কাছে নির্বাহী বিভাগের তথা মন্ত্রীসভার দায়বদ্ধতা। মূলতঃ আইনসভা বা পার্লামেন্টের কাছে নির্বাহী বিভাগের এই দায়িত্বশীলতার জন্যেই সংসদীয় সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সরকারের দায়িত্বশীলতা অধিকতর নিশ্চিত করাই সংসদীয় পদ্ধতির লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতে সরকারের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনায় সংসদ কেবল যে খবরদারিই করে তাই নয়, বরং সংসদের আস্থা-অনাস্থার উপর সরকারের অস্তিত্বই নির্ভরশীল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'দায়িত্বশলিতা'র ব্যাপারটি শুধু আস্থা-অনাস্থার সাথেই সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা যথেষ্ট ব্যাপক অর্থবোধক ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করে। যেমন এ্যন্থনী বার্চ উল্লেখ করেছেন যে, দায়িত্বশীল সরকার বলতে তার তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবেঃ ১)সরকার দায়িত্বহীন ভাবে কাজ করবে না ;২) সরকার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতকে অনুসরন করবে এবং ৩) সরকার তার কাজ কর্মের জন্যে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকবে (Birch Anthony: 1986) । অর্থাৎ এতে কয়েকটি বিষয়ের সুনিশ্চয়তা বিধান করা হয়। যেমন সরকার শাসিতের অর্থাৎ জনগনের নানাবিধ ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া এবং প্রয়োজন পূরণর ব্যাপারে থাকবে সংবেদনশীল (responsive)। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ্যালেন র‍্যানউইক এবং ল্যান সুইনবার্ণ লিখেছেনঃ Governments which are responsive, follow as a matter of convention, the idea that they ought to listen to, and take note of, the views of different groups within society before devising and implementing policies" (Ranwick:1983)। দ্বিতীয়তঃ সরকার দায়িত্বহীন আচরন ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে। নৈতিক বাধ্য বাধকতার অনুভূতি (a notion of moral obligation) সরকারের সামগ্রিক কাজ কর্মের পশ্চাতে আমানত বা পবিত্র আস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। র‍্যানউইক ও সুইনবার্ন এর ভাষায় ঃ "It is the expectation that individuals who hold the trust of the people carry out their work wisely and with integrity. (Alan Ranwick: 1983) । তৃতীয়তঃ প্রধানত, সরকার সর্বতোভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ থাকে। অর্থাৎ মন্ত্রীসভার আয়ুস্কাল এবং তাদের সম্পাদিত কাজ কর্মের জন্যে মন্ত্রীদের দায়বদ্ধ থাকতে হয় পার্লামেন্টের কাছেই। মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আইনসভা তথা পার্লামেন্ট অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রীসভা তথা সরকারের পতন ঘটে। তাই বলা যা, দায়িত্বশীলতার মোদ্দা কথা হলো জনগণের নির্বাচিত সংসদের কাছে মন্ত্রীদের রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বশীলতা।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদকে কার্যকর করার অন্যতম ভূমিকা রাখে হুইপ। সরকারী দলে যেমন দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হুইপ থাকা প্রয়োজন তেমনি বিরোধী দলেও বিজ্ঞ হুইপ থাকা অত্যাবশ্যক। সেই প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করে লর্ড ব্রাইস এর মন্তব্য হচ্ছে- .....Without the constant presence and activity of the ministerial whip the wheels of government could no go for a day, because the ministry would be exposed to the risk of casual defeat.... Similarly, the opposition ..... finds it necessary to have their whip or whips because it is only thus that they can act as a party' (Quoted in Friedrick:1947)

সংসদকে কার্যকর রাখতে বিরোধী দলের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করে Gaglielmo Farrero মন্তব্য করেন- "In democratic countries the opposition is a means of popular sovereignty as vital and important as the government and to suppress the opposition is to negate the sovereignty of the masses". (Quoted in Hasanujjaman: 1998). John Hobhouse, ১৮২৬ সালে প্রথম His Majesty Opposition বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন। হেগেল এবং কার্লমার্কস এর মতে যে কোন বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের বা এন্টিথিসিসের ফলে জন্ম নেয় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার বা এক নতুন সিনথিসিসের বা সাম্যবাদের" মানব সমাজের এ চিরন্তর বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান শাসন কর্তৃপক্ষের বিপরীতে বিরোধী মত বা আদর্শের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে Grolier Encyclopedia বলা হয়েছে- "The opposition is driven to a party that is out of power and that exists mainly for the purpose of criticizing the party in power and if possible supplanting it". (Grolier Encyclopedia: 1958) ।একই প্রসঙ্গে Dictionary of American Politics বলা হয়েছে- "In the context of parliamentary system it mentions that opposition includes the Political party who either singly on collectively oppose the party in office" (Dictionary of American politics: 1968). অন্যদিকে Robert A

Dhaka University Institutional Repository

Dahl এর ভাষায়- " The right of an organized opposition to turn to the voters and seek their vote against the government in elections and in parliament had been one of the great milestone in the development of democratic institutions. But as observed legal, orderly and peacful mode of Political oppositions are rare throughout the recorded history." (Dahl: 1966) .K.C wheare মন্তব্য করেন- "Opposition ..... means ..... constitutional as well as loyal" (Quated in Hasanujjaman:) ।গণতন্ত্রের ধারণার বিকাশের সাথে সাথে বিরোধী দলের সাংগঠনিক এবং সাংবিধানিক ধারণাটিও লাভ করেছে। গনতন্ত্রে বিরোধী দলকে বলা হয় বিকল্প সরকার এবং বিরোধী দলই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে বিকল্প নেতৃত্বের সৃষ্টি করে। তাই Earnest Barker বিরোধী দলকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার Safety value বলেছেন। যে কোন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব এক অনবদ্য ভূমিকা পালনে ব্রত হয়। কারন, সারকারি দলের একমূখী নীতিসমূহ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে সেটা জনকল্যাণমূখী করার প্রয়াস চালায় বিরোধী দল। সরকারি দলের আলোচনা ও সমালোচনা করে তাদের গনতান্ত্রিক ভাবধারায় ধাবিত করা সম্ভব। উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সংসদীয় সরকার এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। Earnest Barker এর ভাষায়- "Balanced and effective opposition is indeed a powerful instrument to achieve the goals of an instrument to achieve the goals of an effective government. (Barker Earnest: 1967)

বাংলাদেশের পার্লামেন্ট প্রায় দেড়শত বছরের একটি পালামেন্ট। ব্রিটিশ বাংলার প্রথম পার্লামেন্ট অধিবেশন বসে ১৮৬২ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পালামেন্টারি রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সারে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পর পাকিস্থানের এক দশকের (১৯৪৭-১৯৫৮) সংসদীয় রাজনীতি বাধাগ্রস্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্টকে চরম ক্ষমতা দিয়ে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাবার স্ট্যাম্প প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠার বিধান হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে প্রীত বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আবার স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংসদের গুরুত্ব হ্রাসে পায়। এবং ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী পাস করে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই ব্যবস্থা এখনও বিদ্যামান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রওনক জাহান বলেন- 'Bangladesh began with a parliamentary model of government and politics and in the first three years of this new nation's existence, The parliamentarians emerged as the most influential members of the political elite. They played a key role in the formation as well as implemention of public polices. Untill the recent political changes in Bangladesh' (Rounaq Jahan: 1980). । Moudud Ahmed লিখেছেন, "The constitution of Bangladesh envisaged a west minister type of parliamentary system, reflecting the aspirations of the people nurtured for nearly two decades. The Awami leagues commitment since its inception for the establishment of a real living democracy for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled because of the absolute power of the Government' (Ahmed Moudud: 1983) ।

স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে দেশের Constitution রচনা সমাপ্ত করা এবং নতুন Constitution প্রবর্তনের তিন মাসের মধ্যে দেশব্যাপী সাধারন নির্বাচন দেওয়া গণতান্ত্রিক দুনিয়ার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন মানে বিরোধী দলের যথেষ্ট সংখ্যক ভাল মানুষ নির্বাচিত হোক সেদিকে সজাক সৃষ্টি রাখা। কাজেই নির্বাচনে সরকারী দল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের প্রতি উদার হওয়া উচিত ছিল। উদার হতে তারা রাজী ও ছিলেন। রেডিও, টেলিভিমন বিরোধী দল সমূহের নেতাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আপত্তি ছিলনা। কিন্তু পরপর কতকগুলি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেশের সমস্ত দুর্দশা দূর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। তার উপর বছরের শুরুতেই ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারিতে, ভিয়েতনাম উপলক্ষে ছাত্রদের মিছিলের উপর উপর গুলি চলানোর দরুণ দুইজন ছাত্র নিহত ও অনেক আহত হয়। পরদিন দেশব্যাপী হরতাল হয়। ফলে আওয়ামী লীগের ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারায়। মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নই সরকার বিরোধী এই আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ আন্দোলনের কারনেই ছাত্র লীগের লোকেরা ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের অফিস পুঁড়িয়ে দেয় তাতেও আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হয়। এই অজনপ্রিয়তা প্রসারিত হয় সরকারের বর্ডার প্যাক্ট ও পাটনীতি উপলক্ষ করে। অপরদিকে বিরুরাধী দলসমূহের মধ্যে একটা যুক্তফন্ট গড়ে উঠার চেষ্টা থাকলে পরে তা আর হয়নি। বিরোধী দল সমূহের আস্থা ও জয়ের আশা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে একুশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যখন মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভা করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বদলীয় বিরোধী নেতা মওলানা ভাসানী সাহেব পল্টনে এক বিশলাল জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। এ অবস্থায় আওয়ামীলগ লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা বোধ হয় সম্ভব ছিল না । রেডিও টেলিভিশনে অপজিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যানবাহনের অভাবে তাঁরা ঠিকমত প্রচার চালাতে পারেননি। অন্যদিকে শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূনিঝড় ট্যুর করেন। মন্ত্রীরাও সরকারী যানবাহনের সুবিধা নেন। যার ফেলে নির্বাচনে অপজিশনের ভারডুবি হয় এবং অপজিশন হন মাত্র ৭ জন। (**আহমদঃ**) জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে ন' জন বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য মিলে এক বিরোধী দল গঠন করে কিন্তু সরকার তা গ্রহন করতে অস্বীকার করে । প্রধান মন্ত্রী যুক্তি দেন যে, বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে অন্তত ২৫ জন্য সদস্য হতে হবে। এমন কি বিরোধী গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতির জন্য কম পক্ষে ১০ জন সদস্যের প্রয়োজন। (১৯৭৩-৭৫) আমলে জাতীয় সংসদে ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘন্টা বৈঠক হয় এবং এতে ১০০টি বিল পাস হয়। ১০০ টি গৃহীত বিলের মধ্যে পর্যাপ্ত আলোচিত ১৪টি বিলের তিনটি সম্পর্ক বিরোধী দলীয় সদস্যরা প্রবল আপত্তি করেন এবং এ গুলোর মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা হয় এবং এই বিল গুলি সম্পর্কে বিরোধী দলীয় সদস্যদের কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া তারা বিল পাশের সময় ওয়াক আউট করেন। ফলে বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপস্তিতে তিনটি বিল পাস হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এক জন সংসদ সদস্য লিখেছেন, ' আমাদের ৭ জন সদস্যের বক্তাব্যকে শেখ মুজিবের পার্লামেন্টের সদস্য বা তীব্র ভাবে বিরোধিতা করত। আমরা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করলে আওয়ামী লীগের শতাধিক এমপি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করত এবং জঘন্য ভাষায় গালাগাল করত। ৭৩ এর সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারন সম্পর্কে Rounaq Jahan লিখেছেন, " In a relatively short span of three years following the birth of the country the ruling elite of Bangladesh first adopted and later rejected parliamentary democracy as its model of government and politics. The constitutionals experimentations in Bangladesh in the aftermath of liberation are very similar to the constitutional changes in other new states of the third world. (Rounaq Jahan:1980) যে সমস্ত কারনে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় তা হলোঃ

১) তৎকালীন সংসদের ৩১৫টি আসনের মধ্যে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি । বিরোধী দলসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, মোজাফফর আহম্মদ, ডাঃ আলিমুর রাযী জনাব নরুর রহমান, হাজী মোহাম্মদ দানিশ প্রভৃতি জন পঁচিশের মত অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানকে জয়ী হতে দেওয়া আওয়ামী লীগের ভালোর জন্য উচিত ছিল। এসব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়র আপজিশন থাকলে পার্লামেন্টের সজীবতা বৃদ্ধি পেতে। তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সরকারী দলের মেম্বররা ভাল ভাল দক্ষ পার্লামেন্টারীয়ান হয়ে উঠতেন। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যার্থতার গতি আরো ত্বারম্বিত হয় ।

২) ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের কারনে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। Arend Lij Phart বলেন, "A Great many of the developing countries, particularly those in Asia and Africa, but also some south American countries are beset by political problems crising from the deep divisions between segment of their populations and the absence of a unifying consensus. (Phart: 1977)

Dhaka University Institutional Repository

৩) সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকা একান্ত প্রযোজন । গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর দলগুলোর শ্রদ্ধাবোধ না থাকায় বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়।

৪) এ সময় বিশ্ববাজারেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। এছাড়াও ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে দূর্ভিক্ষের কারনে দেশের অর্থনীতি অনেকটা খারাপ হয়ে যায়। মূলত এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সরকার প্রশাসনিক পরিবর্তন করে এক কঠোর নিয়ন্ত্রামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হন।

৫) তাছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যার্থতার অন্যতম প্রধান কারন ছিল দক্ষ ও অনুগত আমলার অভাব। Moudud Ahmed বলেন, "Mujib is the greatest phenomenan of our history. His death was not his end. He will continue to remain as a legend in the political life of Bangladesh. Bengalis might have had leaders in their history. More intelligent, more capable and more dynamic than sheikh Mujib but none give so much to the Bengalis Political independence and national Identity. It is Mujib who in the end was able to identify himself not only with the cause of the Bengalis but with their dreams. He became the symbols of Bengali nationalism, which birth to a movement leading to an independent and sovereign identity in whatever form Bangladesh exists or whatever reversal it tales in its domestic political content on in its foreign relations. Mujib's position as a leader of the nationalist movement will not alter. (Moudud Ahmed: 1983)

সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য যেরূপ দায়িত্বশীল বিরোধীদলের প্রয়োজন বাংলাদেশে তার অভাব ছিল। এছাড়া শেখ মুজিব যখন উপলব্ধি করেন যে, তিনি জনগনের প্রত্যাশা পুরন সক্ষম হচ্ছেন এবং বামপন্থী বিপ্লবীরা তাঁর সরকারের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন

Dhaka University Institutional Repository

তিনি "শোষিতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে নিজ হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে নেন এবং এক দলীয় রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । এভাবে বহু কাঙ্খিত সংসদীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সংসদীয় বিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারী দলের Backbencher এমপিরা বেসরকারী সদস্য । তাদের প্রধান হলো সরকারী সদস্য অর্থাৎ মন্ত্রিভার সদস্যদের জবাবদহিতে নিশ্চিতভাবে এক যোগে কাজ করে কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি দলীয় সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের কোন মানসিকতা বিকাশ লভ করেনি। পার্লামেন্টেটারিয়ান আবদুল মঈন খান বলেন- It has to be understood that in our form of government all members whether belonging to the opposition or treasury bench are non-government members, only government members in the parliament being those holding ministerial offices. They are morally duty bound and pledged to the people of this country as their representatives to discharge their responsibilities with the objective of not only serving the party alone but first and formost to fulfill their commitment to our people and our country."(Khan, :1999)

বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ততার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক ব্যবস্থার নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে তা কতটুকু কার্যকারিতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে তা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। পুনঃপ্রতিষ্ঠীত এ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মেদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রঃ প্রাসঙ্গিকচিন্ত্রা ভাবনা' "গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং প্রশাসন বিজ্ঞানীগণ নানা প্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা নির্ণয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তবে এ গ্রন্থের অধিকাংশ নিবন্ধনই তথ্য সমৃদ্ধ নয়। উদাহরণ স্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থে ড. কামাল আহমেদ সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থেকেছেন। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সার্বিক

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমের উপর কোন তথ্য প্রদান করেন নি। "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন উত্থাপিত ভাবনা ও প্রশ্নাদি" নিবন্ধে অধ্যাপক হাসানউজ্জামান সংসদীয় গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া সমাজের প্রসূন হিসেবে। পাশ্চাত্যের যে প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে অনুরূপ প্রেক্ষাপটে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তা যে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিকূলতা ও দুর্বিপাকের মধ্যে পড়বে তা নিশ্চিত সত্য বলে তিনি অভিহিত করেছেন। তিনি তার নিবন্ধে বিরোধী দলের প্রসঙ্গ টেনে আনলেও তা কেবলমাত্র কতিপয় তাত্ত্বিক দিকের অবতারণ করেছেন। (আহমেদ: ১৯৯১) বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার সার্বিক রূপ রেখা দাড় করানোর ক্ষেত্রে Nizam Ahmed লিখিত "The Parliament of Bangladesh" গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবিদার। Nizam Ahmed নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে পুনপ্রবর্তিত পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রম হতে শুরু করে এর কমিটি ব্যবস্থার উপরও আলোকপাত করেছেন। তাছাড়া, আলোচ্য গ্রন্থে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিকীকরণের পথে অন্তরায় সমূহের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। নিজাম আহমেদ সংসদীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সার্বিক পর্যালোচনা করায় বিরোধী দলের অবস্থানকে তেমনভাবে আলোকপাতকরেননি (Ahmed : 2002) । সংসদীয় ব্যবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Parliament in Asia। Philip Norton এবং Nizam Ahmed সম্পাদিত-এ গ্রহন্থটিতে এশিয়ার কয়েকটি নবীন এবং পুরাতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের ÒIn Search of institutionalization: Parliment in Bangladesh" Norton Philip & Nazim Ahmed নিবন্ধে কতিপয় বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন চলকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ প্রবন্ধে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকী করণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও সংসদে অবস্থিত বিরোধী দলের অবস্থানের উপর তেমন গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। (Philip & Ahmed : 1999) । বাংলাদেশে বর্তমানে যে, প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে অভিহিত হবার ক্ষেত্রে দুটি গ্রন্থের উপর গুরুত্ব আরোপ

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। এ গ্রন্থে দুটি হচ্ছে অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন রচিত Politics and Society in Bangla (Hossain) এবং অপরটি হচ্ছে অধ্যাপক Nazma Chowdhury রচিত "The legislative process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58 (Chowdhury:1980) । উভয় গ্রন্থেই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের উপনিবেশিক এবং আভ্যন্তরীন উপনিবেশিক পর্যায়ে আইনসভার কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থদুটি বাংলাদেশের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। Al Masud Hasanuzzaman Gi "Role of pposition in Bangladesh Politics বইটিতে সংসদীয় ব্যবস্থার করা হয়েছে। (Hasanuzzaman: 1998)

বাংলাদেশে অষ্টম জাতয়ী সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমাদের এই আলোচনা অন্তর্ভূক্ত হওয়ায়, অষ্টম জাতীয় সংসদ কতটুকু কার্যকর ছিল, তা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। অষ্টম জাতীয় সংসদের অকার্যকরিতার কথা বর্ণনা করতে প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে বলা হয়-"মৌলিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোগত সংস্কার বা তাকে গতিশীল করা যদি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি ধরা হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, জনগন এক্ষেত্রে একটি ফাঁকি পেছেয়ে। জোট সরকারের আমলে এই চিত্রটি বড় বিবর্ন" (প্রথম আলোর : ২০০৬) । নব্বইয়ের পরিবর্তনের পর সংসদকে সব রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা ছিল। কিন্তু বাধা ছিল বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী গত নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তার প্রথম ভাষণে এর গুরুত্ব স্বীকার করলেও তাকে বাস্তবে রূপ দিতে কোনো চেষ্টা নেননি। বরং তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতি নয়, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর খাটিয়ে পাঁচ বছর পার করেছেন। পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলোতে যে ভাবে অষ্টম সংসদকে অকার্যকর বলে, খবর প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয়টি বেশি নজর কেড়েছে। কারণ তারা অষ্টম সংসদ অকার্যকর হওয়ার পিছনে, সরকারী দলের সাথে সাথে বিরোধী দলকেও দায়ী করেছেন। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে-"জনগন কর্তৃক নির্বাচিত সংসদ কি এই ভাবেই চলিবে? প্রধানমন্ত্রী তাহার সমাপনী বক্তৃতায় সংসদের মেয়াদ পূর্তিকে বড় সাফল্য বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। তাহার সহিত একমত হইয়াও বলা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সংসদ, প্রত্যাশা পূরন করিতে পারে নাই। এই ব্যর্থতার মূল দায় লইতে হইবে সরকারকেই। বিরোধী নেত্রী সংসদকে বলিয়াছেন অকার্যকর। সংসদ অকার্যকরভাবে চলিবার দায় বিরোধী দলও এড়াইতে পারিবে না। সর্বশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া রেকর্ড গড়িলেও তাহারা এই সংসদের শুরুর দিকে নেতিবাচক অবস্থানই লইয়া ছিলেন। সংসদ বর্জনের ক্ষতিকর ধারা হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাহারাও ব্যর্থ হইয়াছেন (যুগান্তর :২০০৬) । সংরক্ষিত নারী আসন মিলিয়ে সরকারি দলের সাংসদের সংখ্যা ২৪০ এর উপরে হলেও কোরাম সংকট ছিল এ সংসদের নিত্যদিনের ঘটনা। সাংসদদের উপস্থিতি বাড়াতে স্পিকার সর্বাধিক উপস্থিতির জন্য সনদ ও পুরস্কার প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। সংসদ কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সংসদীয় কমিটি। প্রথম ২ বছর সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়নি। তাছাড়া ১৭তম অধিবেশন পর্যন্ত এ সংসদ ছিল নারী প্রতিনিধিত্ব শূন্য। অষ্টম সংসদকে বিভিন্ন মহল থেকে একটি ব্যর্থ সংসদের মুর্তিমান প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (যুগান্ত র :২০০৬) ।

অষ্টম জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সংখ্যাগরিষ্টতা ছিল চারদলীয় জোটের। অথচ প্রথম থেকেই কোরাম সঙ্কটে ভুগেছে এ সংসদ। কোরাম সংকটের দিক থেকে অষ্টম সংসদ রেকর্ড গড়েছে। ২০০৩ সালের ২১ জুন নজিরবিহীন প্রায় দু'ঘন্টার কোরাম সংকটের কারনে সংসদ ছিল কার্যত অসহায়। সংসদের গত ১০ বছরের ইতিহাসে এটি নতুন রেকর্ড। এই সংসদের ৩'শ ৭৩টি কার্যদিবসের মধ্যে ২ শ ৯৭ কার্যদিবসই শুরু হয়েছে কোরাম সংকটের মধ্য দিয়ে। শেষ অধিবেশনটি ছাড়া কোরাম সংকটের কারনে প্রায় প্রতিদিনই গড়ে ২০ থেকে ৩০ মিনিট দেরি করে অধিবেশন শুরু করাতে হয়েছে। কখনও কখনও কোরাম সংকটের কারনে নির্ধারিত কাজ ফেলে রেখেই অধিবেশন মুলতবি করার ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। সংসদ সদস্য খুনের দু'টি ঘটনাও বাংলাদেশের সংসদের ইতহাসে ৮ম সংসদকে বিশেষভাবে স্বরণ যোগ্য করে রাখবে ২০০৬, (জনকণ্ঠ : ২০০৬) ।অষ্টম জাতীয় সংসদকে অকার্যকর বলে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে "ক্রিকেটে দ্রুততম সময়ে সেঞ্চুরি বা অর্ধসেঞ্চুরি করার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। সংসদের ক্ষেত্রে এধরনের রেকর্ড রাখা হয় কি না আমাদের জানা নেই। এ রকম নিয়ম থাকলে আমাদের স্পিকার ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে সে "বুক অফ রেকর্ডস"-এ সসম্মানে স্থান করে নিতেন। তিনি মাত্র ১০ মিনিটে বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত জনগুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি মূলতবি নোটিশ নাকচ করে সম্প্রতি যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন, সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের নিকট ভবিষ্যতে তা কেউ ভাঙতে পারবে বলে মনে হয় না। (সংবাদ : ২০০৬) সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা অন্যতম। আর সেই স্পিকারের ভূমিকা অষ্টম জাতীয় সংসদে কেমন ছিল তা উপরিউক্ত লেখা থেকে বুঝা যায়। আর এই থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি অষ্টম জাতীয় সংসদ ছিল অকার্যকার একটি সংসদ। অষ্টম সংসদকে অকার্যকর বলে বিরোধীদলীয় উপনেতা এডভোকেট আবদুল হামিদ বলেছেন "বিরোধী দল সংসদকে কার্যকর করার চেষ্টা করলেও সরকারী দল অসযোগিতা করেছে। জনগনের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেয়নি। নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, এই পাঁচ বছর সংসদ ছিল সম্পূর্ণ অকার্যকর" (ইত্তেফাক: ২০০৬) ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় -৩

বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ ও রাজনীতি

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসে বাণিজ্য বসতি স্থাপন করে সতেরো শতকের মাঝামাঝি। আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে কোম্পানি বঙ্গের সর্বময় কর্তা। বাণিজ্যের পাশাপাশি রাজ্য স্থাপন ছিল সমকালীন ইউরোপীয় বেণেবাদ নীতির পরিপন্থি। উল্লেখ্য যে, সমকালীন ইউরোপীয়রা সাগরের ওপাড়ে গিয়ে জনমানবশূন্য বা আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকা দখল করে স্ব স্ব জাতির পক্ষে উপনিবেশ স্থাপন করলেও বঙ্গদেশই প্রথম সভ্য দেশ যেখানে একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, এ অভূতপূর্ব ঘটনা কোন সচেতন পরিকল্পনার ফসল নয়। তাঁরা মনে করেন যে, বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘটেছে পর্যায়ক্রমে এবং নানা অনভিপ্রেত ঘটনা প্রবাহের ফলে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দলিলে দেখা যায় যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স কোম্পানির বেঙ্গল কাউন্সিলকে সব সময়ই এখানে রাজ্য স্থাপণের ব্যাপারে নিরোৎসাহিত করেছে, কিন্তু তবুও কালে কোম্পানির বঙ্গরাজ্য প্রতিষ্টিত হলো। দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের মতামতকে উপেক্ষা করে যখন কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বা জোরজবরদস্তির মাধ্যমে কোন সুবিধা আদায় করতে পেরেছে, কোর্ট তা সবসময়ই অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কোর্ট কখনও ঝুঁকি নিতে চায় নি। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল ঝুঁকি নিয়ে সুবিধাজনক সাফল্য দেখাতে পারলে কোট অব ডাইরেক্টর্স তা সব সময়ই মেনে নিয়েছে। বাণিজ্যের সুবিধার্থে কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে রাজ্য স্থাপনের অভিলাষ ক্রমশই দানা বেধে উঠেছিল আঠারো শতকের প্রথম দশক থেকেই।

১৬৫১ সালে সুবা বাঙ্গালার সুবাহদার শাহ সুজার নিকট থেকে একটি নিশানের ওপর ভিত্তি করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক নির্দিষ্ট তিন হাজার টাকা পরিশোধের শর্তে এ দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য শুরু করে। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার এ ব্যবস্থা শুধু কোম্পানির জন্য সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীসময়ে কোম্পানির কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যও এ সুবিধা বেআইনীভাবে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়। এর ফলে সরকারের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশই অবনতি ঘটতে থাকে। এর এক পর্যায়ে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের এদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্য কলকাতা আক্রমণ করেন। এ ঘটনা জন্ম দেয় ষড়যন্ত্রের রাজনীতি যার শেষ ফল পলাশীর যুদ্ধ, বক্সার যুদ্ধ এবং পরিশেষে ১৭৬৫ সালে দীউয়ানি লাভের মাধ্যমে সুবা বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য স্থাপন। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের চূড়ান্ত পরাজয় কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করল। কোম্পানি নীতি গ্রহণ করল সরাসরি ক্ষমতা দখল না করে একজন নামেমাত্র নওয়াব গদিসীন রেখে প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে তুলে নিয়ে দেশের রাজস্বের ওপর হিস্যা বসানো। এ নীতির অংশ হিসেবেই ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর রবার্ট ক্লাইভ সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উরিষ্যার দীউয়ানি লাভ করেন (১৭৬৫)। সম্রাট ও নওয়াবের সঙ্গে চুক্তি হয় যে, দীউয়ান হিসেবে কোম্পানি সুবা বাংলার রাজস্ব সংগ্রহ করবে। চুক্তির শর্তানুসারে কোম্পানি সুবার রাজস্ব থেকে বার্ষিক থোক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাদশাহকে এবং তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা নওয়াবকে প্রদান করবে এবং বাকি রাজস্ব কোম্পানি নিজে ভোগ করবে। দীউয়ানি লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজে এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ না করে এ দায়িত্ব অর্পণ করল একজন নায়েব দীউয়ানের ওপর। নায়েব দীউয়ান হিসেবে নিযুক্ত হলেন চট্রগ্রামের প্রাক্তন ফৌজদার সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খান। নাবালক নওয়াব নজমুদ্দৌলার পক্ষে নিজামত প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বও প্রদান করা হয় রেজা খানকে। অর্থাৎ ১৭৬৫ সালের ব্যবস্থায় দৃশ্যত রেজা খানই হলেন প্রশাসনের প্রথম ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অলিখিতভাবে কোম্পানিরই অদৃশ্য হাতে। দ্বৈত শাসন নামে এ ব্যবস্থায় নায়েব নাজিম এর ওপর সকল দায়িত্ব অর্পিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন ক্ষমতা নেই, আর কোম্পানির কাছে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত, কিন্তু কোন দায়িত্ব নেই। কোম্পানি সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ করলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক ও ভারতীয় রাজন্যগোষ্ঠী তা মেনে নেবে না এ আশংকাবশতই ক্লাইভ কূটনৈতিক চাল দিয়ে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া, দেশ শাসনের জন্য তখন কোম্পানির না ছিল প্রয়োজনীয় লোকবল, না ছিল কোন অভিজ্ঞতা। তবুও ক্লাইভ দীউয়ানি চুক্তি করেন দুটি প্রধান কারণে। একটি রাজনৈতিক। সিরাজউদ্দৌলা বা মীর কাসিমের মত নওয়াবের যেন আর আবির্ভাব না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অপর উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক। কোম্পানির প্রাচ্য বাণিজ্যের পুঁজি স্বদেশ থেকে না এনে প্রাচ্য থেকেই সংগ্রহ করা। ইতোপূর্বে কোম্পানি এদেশে স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে আসত পণ্য কেনার জন্য। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ সরকার বিদেশে ধাতব রপ্তানির ওপর কড়াকড়ি

Dhaka University Institutional Repository

আরোপ করতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোম্পানি চেষ্টা চালায় প্রাচ্য বাণিজ্যের জন্য প্রাচ্যদেশ থেকেই পুঁজি সংগ্রহ করার। সুবা বাংলার দীউয়ানি লাভ ছিল এ নীতিরই একটি অংশ।

দীউয়ানির নামে বাংলায় কোম্পানি যে শোষণ ও উৎপীড়নের রাজ্য কায়েম করল তাতে ব্রিটিশ সরকার এতদিন কোন ভ্রুক্ষেপ করে নি। ১৭৬৯/৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল কোম্পানির বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য। ১৭৭২ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে পার্লামেন্ট কোম্পানির বঙ্গরাজ্য বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন বিপ্লবের পর আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্রিটিশ সরকার বিকল্প কলোনি হিসেবে দৃষ্টিপাত করল ভারতের ওপর। পাশ করল পিট-এর ভারত আইন (১৭৮৪) যার মাধ্যমে কোম্পানির বঙ্গ রাজ্যের ওপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় করা হলো। লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পার্লামেন্ট গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে এ নির্দেশ দিয়ে যে, তিনি একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা ও দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গরাজ্যকে একটি শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। নির্দেশানুসারে কর্ণওয়ালিস ত্বরিৎ গতিতে ভূমি ব্যবস্থা ও প্রশাসনে অনেক সংস্কার আনয়ন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর মাধ্যমে তিনি একটি জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করেন। ভূমির একচ্ছত্র মালিক করা হয় জমিদারকে। জমিদারের ওপর সরকারের রাজস্ব দাবি চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সমর্থন করে এমন একটি প্রভাবশালী অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করা। এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমি নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জমিদার শ্রেণীর উদ্যোগে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা। প্রশাসন, বিচার ও পুলিশ বিভাগকে ঢেলে সাজিয়ে কর্ণওয়ালিস ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করে স্থাপন করেন। একটি উচ্চ বেতনভোগী পেশাগত আমলাতন্ত্র স্থাপন করে কর্ণওয়ালিস ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। যথার্থই বলা হয় যে, কোম্পানির বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ক্লাইভ ও হেস্টিংস এবং এর প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠাতা কর্ণওয়ালিস।

Dhaka University Institutional Repository

তবে বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণভাবে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত হলেও ব্রিটিশ সরকার প্রথম পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে ১৮১৩ সালে যখন পার্লামেন্ট একটি চার্টার অ্যাক্ট বলে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত করে এবং দেশের শাসনভার আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে। উক্ত আইনে কোম্পানির দূরপ্রাচ্য বাণিজ্য বজায় রাখে। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনে তাও বিলুপ্ত করা হয়। এরপর থেকে কোম্পানির অধিকার থাকে পার্লামেন্টের পক্ষে শুধু ব্রিটিশ ভারত শাসন করার ক্ষেত্রে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ব্রিটিশ ভারত শাসনের দায়িত্ব সরাসরি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে। এমনিভাবে কোম্পানির বঙ্গ রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এমনকি প্রদেশরূপেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চেয়ে অনেক কম সুবিধাপ্রাপ্ত। উক্ত দুটি প্রদেশের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন গভর্নর ও গভর্নর-এর কাউন্সিল ছিল। কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য না ছিল স্বতন্ত্র গভর্নর, না ছিল কোন কাউন্সিল। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শাসিত হতো পরোক্ষভাবে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক। গভর্নর জেনারেলের পক্ষে একজন কাউন্সিলর ডেপুটি গভর্নর উপাধি ধারণ করে নামে মাত্র বঙ্গীয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতব্যাপী বিস্তারের ফলে প্রশাসন ও অর্থনীতির দিক থেকে বাংলা প্রদেশ সবচেয়ে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ হয়ে পড়ল। ১৮৫৪ সাল থেকে বাংলার জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু কোন কাউন্সিল ছাড়া। সার্বিক অবস্থা আগের মতই করুণ থাকায় প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির নামে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করা হয়। কিন্তু এর বিপক্ষে রাজনৈতি চাপের মুখে ১৯১২ সালে বঙ্গ বিভাগ রদ করা হয়। কিন্তু যুক্ত বাংলা প্রশাসনিক দিক থেকে আগের পর্বে ফিরে যায় নি। বাংলাকে বোম্বে ও মাদ্রাজের মত একটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হলো। গভর্নরকে সাহায্য করার জন্য স্থাপিত হল একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। বাংলা প্রদেশের রাজধানী হলো কলকাতা এবং কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে। বাংলা বিভাগকে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় স্বাগত জানিয়েছিল। বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার ফলে এ অঞ্চলের রাজনীতির ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া পড়ে। মুসলিম সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং বিকল্প হিসেবে মুসলিম নেতৃবর্গের অনেকে কংগ্রেস মতাদর্শে ঝুঁকে পড়ে। অপরদিকে, মুসলমান নেতৃত্বের অনেকে ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করে মুসলিম রাজনীতি শুরু করে। বস্তুত, ১৯২০ এর পর থেকে বঙ্গীয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে ঘিরেই আবর্তিত হয় এবং পরিশেষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টে বাংলা বিভক্ত হয়।

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী স্থাপনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেক সক্রীয় চেষ্টা সত্ত্বেও সে ঐক্য কার্যকরভাবে কখনও স্থাপিত হয় নি। চিত্তরঞ্জন দাসএর নেতৃত্বে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট নামে যে চুক্তি হয়েছিল তা অকার্যকর হয়ে গেল ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরপরই। এর পর প্রতিটি কাউন্সিল নির্বাচন হয়েছে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রেখে। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব আরও বেড়ে গেল। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বঙ্গীয় আইন সভায় দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপরই ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। দৃশ্যত অসাম্প্রদায়িক হলেও এ দলটিও ছিল মুসলিম রাজনীতি ঘেষা। অর্থাৎ উভয় দল মিলে সহজেই বঙ্গীয় আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল এবং ক্রমাগত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হলো।

১৯৩৫ সালের ভারত আইন সাম্প্রদায়িক ও তফশিলি রাজনীতির জন্ম দেয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল মুসলিম ও তফশিলি রাজনীতির পক্ষে। সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির বিজয় উপমহাদেশের রাজনীতির গতিধারা বদলে দিল। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ছিল পরিবর্তিত রাজনৈতিক চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ। প্রথম স্বতন্ত্র নির্বাচন, তারপর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। স্বাভাবিক কারণেই এ হেন অভাবিত পরিবর্তনকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দল মেনে নিতে পারেনি। দেখা দিল অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সালের ভারত ও বঙ্গ বিভাগ পর্যন্ত সময়কালটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য ক্রান্তিকাল। নানা বাস্তব পরিস্থিতি বাংলার মুসলিম নেতৃত্ব পাকিস্তান আদর্শকে মেনে নিল। এর প্রথম পরিণতি দেশ বিভাগ ও অজস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশকৃত 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে বিভক্ত করে। ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশটি পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামের দুটি ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারতের অংশ হয়। এভাবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের অংশ হিসেবে 'পূর্ব বাংলা' নামক প্রদেশের জন্ম হয়। ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়। বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ৫ আগস্ট খাজা নাজিমউদ্দীন ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে পূর্ব বাংলা আইন সভার সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন এবং পূর্ব বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন (১৪-৮-১৯৪৭)। স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন পূর্ব বাংলায় প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। নাজিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকেই গ্রহণ করা হয় নি যা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার অভাব নির্দেশ করে। ১৯৪৮ এর সেপ্টেম্বরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং নূরুল আমীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রি নিযুক্ত হন। নূরুল আমীন ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পূর্ব বাংলার জমিদারি প্রথা বিলুপ্তি (১৯৫০) ও ভাষা আন্দোলন তাঁর আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সময় ভাষার প্রশ্নটি যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে স্থান এবং নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন থেকে এ ভূখণ্ডে স্বাধিকারের চিন্তা-চেতনা শুরু হয়। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ। অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩০৯টি। এর মধ্যে ২৩৭টি (৯টি মহিলা আসনসহ) মুসলমান আসন, ৬৯টি হিন্দু আসন (৩টি মহিলা আসনসহ), ২টি বৌদ্ধ আসন এবং ১টি খ্রিষ্টান আসন। ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

ভোটার করা হয়েছিল। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬ জন। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম ২১ দফার ভিত্তিতে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। ২১ দফায় উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইন পরিষদকে কার্যকর করা ইত্যাদি। নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২১৫টি আসন, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। খেলাফতে রাব্বানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করে ১২টি আসন। পরে ৭ জন স্বতন্ত্র সদস্য যুক্তফ্রন্টে এবং ১জন মুসলিম লীগে যোগ দেন। মুসলিম লীগের পরাজয়ের পিছনে বহুবিধ কারণ ছিল। ১৯৪৭ এর পর থেকে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক ত্যাগী নেতা কর্মী দল থেকে বের হয়ে নতুন দল গঠন করেন। ১৯৪৭ থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তার দায় দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগকেই বহন করতে হয়। ১৯৪৭ থেকে ৫৪ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিরোধিতা করে এবং ১৯৫২ সালের হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে মুসলিম লীগ বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে প্রকারান্তরে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিল। পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের আসন হাতছাড়া হওয়ায় পাকিস্তান গণপরিষদে ঐ দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। এর ফলে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠনের সুযোগ পায়। যুক্তফ্রন্ট প্রাপ্ত ২২২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের আসন সংখ্যা ছিল ১৪২, কৃষক-শ্রমিক পার্টির ৪৮, নেজামে ইসলামের ১৯ এবং গণতন্ত্রী দলের ১৩। যুক্তফ্রন্ট দলের প্রধান নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (আওয়ামী মুসলিম লীগ) এবং এ.কে ফজলুল হক (কৃষক-শ্রমিক পার্টি)। নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী অংশ গ্রহণ করেন নি এবং ফজলুল হককে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। শুরুতেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয় এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। অবশেষে ১৫ মে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগে ফজলুল হকের আপোস হয় এবং তিনি এ দলের ৫ জন সদস্যসহ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এ মন্ত্রিসভার আয়ু ছিল মাত্র ১৪ দিন। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ সরকার সুনজরে দেখে নি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার চক্রান্ত করতে থাকে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শিল্পকল-কারখানায় বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। এতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার ব্যর্থ বলে দোষারোপ করা হয়। নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা জন পি. কালাহান ফজলুল হকের এক সাক্ষাতকার বিকৃত করে প্রকাশ করেন যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে শাসকগোষ্ঠী তাঁকে দেশোদ্রোহী ঘোষণা করে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ মে (১৯৫৪) যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে যা ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত বহাল থাকে।

ফজলুল হককে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি নিয়োগ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি হয়ে ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় তাঁর দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। যুক্তফ্রন্টভুক্ত মুসলমান সদস্যবৃন্দ দুধারায় বিভক্ত হন। আওয়ামী মুসলিম লীগের ধারাটি ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ গ্রহণ করে। এ সময় (১৯৫৫) আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। অপর পক্ষে ফজলুল হকের জোট রক্ষণশীল ধারার রাজনীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের নিকট তাঁদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালের ৩ জুন কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ পান। নবনিযুক্ত এ মন্ত্রিসভার প্রতি প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থা আছে কিনা, তা প্রমাণ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবান সংক্রান্ত আওয়ামী লীগ এর দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। এমনকি পরবর্তী আট মাসেও আইন পরিষদের কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নি।

১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হলে প্রদেশে তাঁর দলের অবস্থান দৃঢ় হয়। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার আড়াই মাস পর ফজলুল হক আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে তাঁর দলীয় মন্ত্রিসভার পতন হবে এ

Dhaka University Institutional Repository

আশঙ্কায় তিনি ২৪ মে আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেন। সাত দিন পরেই এই আদেশ প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা বহাল করা হয়। এবারও মন্ত্রিসভাকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এভাবে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অসাংবিধানিক পন্থায় ৩০ আগষ্ট ১৯৫৬ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ফজলুল হকের গভর্নর পদ লাভ এবং পূর্ব বাংলায় তাঁর দলের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার বিনিময়ে তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেন এবং তা রক্ষা করেন। প্রতিশ্রুতি দুটি ছিল প্রথমত গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া সংবিধান তাঁর দল সমর্থন করবে, দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা সমর্থন করবে না। কৃষক-শ্রমিক পার্টি যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরোধিতা করায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়। কিন্তু অধিবেশন শুরুর কয়েক ঘন্টা পূর্বে মুখ্যমন্ত্রির পরামর্শে গভর্নর অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং তদস্থলে ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু ও বামদলগুলির কোয়লিশন সরকার গঠিত হয়। এ মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রি নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান। ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তেরো মাস (১২-৯-৫৬ থেকে ১৮-১০-৫৭) এবং পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় আঠারো মাস (৬-৯-৫৬ থেকে ৩১-৩-৫৮)। একই সঙ্গে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে পূর্ব পাকিস্তানে অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে পাওয়ার স্টেশন নির্মাণ, জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠন, ফেঞ্চুগঞ্জে গ্যাস কারখানা স্থাপন, সাভারে ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধার জন্য ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওয়াপদা) গঠন, ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডি.আই.টি) প্রতিষ্ঠা এবং 'গ্রেটার ঢাকা সিটি মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন, ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এফ.ডি.সি) প্রতিষ্ঠা, ঢাকার রমনা পার্ক গড়ে তোলা, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ঢাকা-আরিচা, নগরবাড়ি-রাজশাহী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ, প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্ল্যানিং বোর্ড গঠন এবং তিন বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রণয়ন। আওয়ামী লীগ সরকার ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে।

মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করলে আওয়ামী লীগ থেকে ২৮ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করে ন্যাপে যোগদান করেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন দেন। কিছু সংখ্যালঘু সদস্যও আওয়ামী লীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রাদেশিক আইন পরিষদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে বাজেট পাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়লে সরকার গভর্নরকে বাজেট অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত রাখতে অনুরোধ করে। কিন্তু ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন (৩১-৩-৫৮) এবং আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এসময় কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুনের রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিসভা আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে টিকে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নর পদ থেকে ফজলুল হককে বরখাস্ত করে (১-৪-৫৮) এবং পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারিকে অস্থায়ী গভর্নরের দায়িত্ব দেয়। নতুন গভর্নর আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনর্বহাল করেন (১-৪-৫৮)। আস্থাভোটে সরকার ১৮২-১১৭ ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু এর দেড় মাস পর (১৮-৬-৫৮) সরকার খাদ্য পরিস্থিতির ওপর এক ভোটাভুটিতে হেরে যায়, ফলে ১৯ জুন ১৯৫৮ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় এবং ২০ জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি সরকার গঠন করে। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ ন্যাপের সমর্থন নিয়ে আইন পরিষদে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে অনাস্থা ভোটে (১৫৬-১৪২) পরাজিত করে (২৩-৬-৫৮)। কিন্তু তখন আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ না জানিয়ে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় (২৫-৬-৫৮)। এর দুমাস পর (২৫-৮-৫৮) আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। এভাবে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সাতটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে আইন পরিষদে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

একদল বিক্ষুব্ধ পরিষদ সদস্য কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হয়।

পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি বরখাস্ত, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহ অবলুপ্ত, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত এবং মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করা হয়। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইসকান্দার মির্জাকে অপসারিত করে সর্বময় ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এভাবে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। সামরিক আইন জারির পর পরই আইয়ুব খান রাজনীতিবিদ, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, ধনী ব্যবসায়ী, সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী, জাতীয় ও আইন পরিষদের সদস্য প্রমুখের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর Election Bodies Disqualification Order, 1959 (EBDO) ‰es Public Offices Disqualification Order (PODO) নামে দুটি আদেশ জারি করেন। EBDO-এর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের ৩,৯৭৮ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩,০০০ জন রাজনীতিবিদ রাজনীতি করার অধিকার হারিয়ে ছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন ও প্রাদেশিক সার্ভিসের ১৬৬২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। PODO-র আওতায় যেসকল সংবাদপত্রে প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকারের কথা লেখা হতো (যেমন ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার) সেগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করে সরকারি-আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা হয়।

আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসনামলের অভিনব সৃষ্টি হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র। ১৯৫৯ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রণীত মৌলিক গণতন্ত্র ছিল চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ছাড়াও মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় আইয়ুব খান গ্রাম পর্যন্ত সমর্থক গোষ্ঠি গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীকে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, যারা

Dhaka University Institutional Repository

Electoral College হিসেবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটারে পরিণত হন। এভাবে জনগণ প্রেসিডেন্ট ও আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, জাতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দল ও জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায় এবং সীমিতসংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার সহজ হয়। ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি সারাদেশে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব খান ১৩ জানুয়ারি (১৯৬০) Presidential Election and Constitutional Order, 1960 জারি করেন এবং এ অধ্যাদেশ বলে ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) হ্যাঁ - না ভোটের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং তা ৮ জুন থেকে কার্যকর হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ১ মার্চ থেকে ৮ জুনের মধ্যে দেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত করেন। ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ডাকে ও রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ধর্মঘট একনাগাড়ে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। এভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান সংবিধান ঘোষণা করা মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাশ বর্জন করে। ১৯৬২-এর সেপ্টেম্বরে আরেকটি আন্দোলন হয়, যা 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে অভিহিত। শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে বাবুল, গোলাম মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ প্রমুখ নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় আড়াইশ জন। এ আন্দোলনের ফলে সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত রাখে। এ আন্দোলনের গুরুত্ব এই যে, এ সময় থেকে ছাত্ররাই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্র সম্প্রদায় প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' রূপে পালন করে আসছে। ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক আইন তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদগণ দলীয় রাজনীতি করার অধিকার ফিরে পান। সোহরাওয়ার্দী সকল দলের সমন্বয়ে আইয়ুব

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী একটি ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানান। তার উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ মিলে ৪ অক্টোবর (১৯৬২) ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট বা এন.ডি.এফ নামে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সংবিধানের গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল এ ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফ্রন্ট গঠনের পিছনে সোহরাওয়ার্দীর আরেকটি কৌশল কাজ করেছিল। এবডো আইনে সাজাপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদের জন্য রাজনীতি করা নিষিদ্ধ থাকলেও ফ্রন্টের কর্মসূচিতে অংশ নেয়ায় কোন বাধা ছিল না। তাই তিনি ফ্রন্ট গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। খুব শীঘ্র ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৬৩ এর ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করার পরবর্তী মাসেই (২৫ জানুয়ারি ১৯৬৪) আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ইতোপূর্বে ন্যাপ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল আত্মপ্রকাশ করে। ফলে এন.ডি.এফ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে একক প্রার্থী দেওয়ার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে Combined Opposition Party (COP) নামক একটি জোট গঠন করে। COP মিস ফাতিমা জিন্নাহকে (মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী) প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটার ছিলেন ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী। আইয়ুব খান ঐ সব গণতন্ত্রীদের বশীভূত করেন। নির্বাচনে জনগণের মধ্যে মিস জিন্নাহর পক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেলেও নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান যেখানে ৪৯,৯৫১ ভোট পান, সেখানে মিস ফাতিমা পান মাত্র ২৮,৯৬১। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এ সব নির্বাচনে কনভেনশন মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে যে, মৌলিক গণতন্ত্র যতদিন থাকবে ততদিন আইয়ুব খানকে অপসারণ করা সম্ভব হবে না। আইয়ুব খানের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একটি বিশেষ স্বার্থ ও সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পড়ে। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করার দাবি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম ইস্যু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ ভোটের দাবি উচ্চারিত হয়। নির্বাচনী ফলাফল থেকে সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তান বাসীর ক্ষোভ কমতে না কমতেই শুরু হয় ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সময় এটা স্পষ্ট হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল না। এমনকি উক্ত যুদ্ধের সতের দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এ প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অতএব ১৬শ কিমি ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান যে একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল তা আরেক বার প্রমাণিত হলো। ইতোমধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন মহলকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমলাগণ ছিলেন প্রশাসনের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। আমলাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল নগণ্য। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ২,৯০০। করাচিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানকার সকল অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই একচেটিয়া চাকরি লাভ করে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালিদের পক্ষে সেখানে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরি লাভ করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেয়ায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের সাফল্যলাভ সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দিন দিন বাড়তেই থাকে। ১৯৬৬ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৩৮ ও ৩,৭০৮ জন এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬,৩১০ ও ৮২,৯৪৪ জন। ১৯৬২ সালে ফরেন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানিদের অবস্থান ছিল ২০.৮%; ১৯৬৮ সালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের অফিসারের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে অনুপাত ছিল ১০ : ৯০। শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, ১৯৪৮-৫৫ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা (১৩.৫%)। ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মাত্র ১০% ব্যয় হয় পূর্ব পাকিস্তানে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে উন্নয়ন খাতে খরচ হয়

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯৬.২ মিলিয়ন টাকা, সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে খরচ করা হয় মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা। পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে পর্যায়ক্রমে তিনটি রাজধানী শহর (করাচি, রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদ) নির্মাণ করা হয়। কেবল করাচিকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয় ৫,৭০০ মিলিয়ন টাকা, যা উক্ত সময়কালে পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%, যে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৫.১০%। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদের উন্নয়নের জন্য ৩,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হলেও ঢাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী ও সামরিক-বেসামরিক বিভাগ সমূহের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত হওয়ায় চাকুরির সুবিধা ছাড়াও বিভিন্ন ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং নির্মাণ ও সরবরাহ ক্ষেত্রে যে কর্মসুযোগ সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য, নির্বাচনে প্রাপ্য ফলাফল লাভে ব্যর্থতা, পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৭৩৫ জনই তাৎক্ষণিকভাবে তা নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব সম্মেলন স্থান ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। লাহোরে শেখ মুজিব যে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করবেন সে বিষয়ে দলের কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়।

শেখ মুজিবসহ দলের অন্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচার শুরু করেন। ছয় দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি হয় এবং এতে আতঙ্কিত শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ধর পাকড় শুরু করে। ৮ মে (১৯৬৬) শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন (১৯৬৬) গোটা প্রদেশে হরতাল পালন করে। শ্রমিক শ্রেণী এ ধর্মঘটে সাড়া দেয়। ৭ জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০জন নিহত হয়। ৭ জুন হরতালের পর সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৫ জুন ইত্তেফাক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) গ্রেফতার হন এবং ১৬ জুন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৯,৩৩০ জন কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতির উপর নতুন করে হামলা আসে। সরকার ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়।

আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ ১৯৬৭ সালের ২ মে পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট বা পি.ডি.এম নামক একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করে। পি.ডি.এম আট দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ আট দফা ছিল ছয় দফার বর্ধিত সংস্করণ। পি.ডি.এম-এর আট দফায় কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনই নয়, দশ বছরের মধ্যে দুপ্রদেশের বিরাজমান বৈষম্যাবলি দূর করার কর্মসূচিও দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবি ছিল একটি আঞ্চলিক দলের দাবি, অপর পক্ষে পি.ডি.এম-এর আট দফা দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। যেহেতু পি.ডি.এম-এর আট দফার মূল দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন, সেহেতু সরকারের সকল ক্ষোভ পড়ে শেখ মুজিবের উপর। সরকার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে জনবিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং বিরোধী দলীয় জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে (৬-১-৬৮)। এবং একে আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানসহ মোট ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হয়। শুরু হয় নতুন করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য এন.ডি.এফ, পি.ডি.এম জোটদ্বয়সহ ছয় দফাপন্থি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি' বা ডাক (DAC) গঠন করে। তবে ডানপন্থি ও বামপন্থিদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় ডাকের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি পালন করা কঠিন হয়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' (Students Action Committee) গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দাবিও ১১

Dhaka University Institutional Repository

দফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে ১১ দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। আইয়ুব বিরোধী মিটিং মিছিল সমাবেশ নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণে আন্দোলন তীব্র হয়। সরকার পুলিশ, ই.পি.আর, সেনাবাহিনী দিয়ে আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র নেতা মোঃ আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তা গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানি নিহত হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা প্রক্টরিয়াল দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হলে গণআন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 'জয় বাংলা' শ্লোগানের উদ্ভবও ঘটে ঐ সভায়। আইয়ুব খান আপস-মীমাংসার উদ্যোগ নেন। তিনি ১০-১৩ মার্চ (১৯৬৯) রাওয়ালপিন্ডিতে বিরোধী নেতাদের বৈঠকের আয়োজন করেন। ভাসানী ন্যাপ ও পিপলস পার্টি ঐ বৈঠক বয়কট করলেও শেখ মুজিব বৈঠকে যোগদান করেন এবং ছয় দফা ও ১১ দফা দাবির পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করেন। বৈঠকে ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডানপন্থি দলগুলি এ সিদ্ধান্তে খুশী হলেও আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ওয়ালী) বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে। এ দুদল 'ডাক' থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়।

ইতোমধ্যে আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানেও তীব্ররূপ ধারণ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুব খান ২৪ মার্চ (১৯৬৯) তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭০

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২৮ মার্চ উক্ত নির্বাচনের 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal framework order)-এর মূল ধারাগুলি ঘোষণা করা হয়। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এ নীতিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। আইন কাঠামো আদেশে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ (১৩টি মহিলা আসনসহ) এবং তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭টি মহিলা আসন সহ ১৬৯টি আসন নির্ধারণ করা হয়। আদেশে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে ১২০ দিনের মধ্যে 'শাসনতন্ত্র বিল' নামক একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলেও জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে দেখা যায় যে, আইন কাঠামো আদেশে জাতীয় পরিষদের অস্তিত্ব প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করা হয়। আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ ও ন্যাশনাল লীগ ছাড়া অন্য সকল দল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিসমূহের ওপর 'রেফারেন্ডাম' হিসেবে অভিহিত করে। পাকিস্তানের প্রায় ১১টি দল এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তবে সকল শক্তিশালী রাজনৈতিক দল (যেমন আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি) ছিল আঞ্চলিক।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দুলক্ষ লোক নিহত হলে উক্ত অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি ঘূর্ণি-উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন একমাস পর অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টির মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পি.পি.পি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন পায় নি। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফলা ঘোষিত হওয়ার পর পরই পি.পি.পি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো দাবি করেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্বকারী পি.পি.পি-র সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোন সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। এর প্রত্যুত্তরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয় যে, যেহেতু এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক নয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি ম্যান্ডেট ঘোষণা করেছেন অতএব সংবিধান প্রণয়নে তা রদবদল সম্ভব নয়। এসব তর্ক-বিতর্কের মাঝে ইয়াহিয়া খান ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় বসএব। কিন্তু ভুট্টো তাঁর মতামত গ্রহণের পূর্ণ অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। সকল সরকারি কর্মকাণ্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ৩ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করে। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের মাধ্যমে তিনি ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেন– (ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে, (খ) অবিলম্বে সৈন্য বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং (ঘ) (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এ শর্তগুলি মানলেই কেবল তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আওয়ামী লীগ যোগদান করবে কিনা। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সংগে বৈঠক করেন। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় এসে আলোচনায় যোগ দেন। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করছিলেন। অবশেষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় আকস্মিকভাবে গণহত্যা শুরু করে। পাকবাহিনীর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, যা নয় মাস ধরে চলে।

২৭ শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন। I declare, We have already framed a sovereign legal government under sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratize government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will see friendship with all notions and strive for international peace. I appeal to all governments to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh. "The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal government of Bangladesh and is entitled to recognition form all democratic nation of the world.

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে (তিনি তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন) উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত) শপথ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় মুক্তিযুদ্ধ।

নয় মাসের এই মুদ্দতটাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দুই মাসের মুদ্দতটা ছিল একটা নির্বোধ জংঙ্গী সরকারের পক্ষে নিরস্ত্র নিরপারাধী দেশবাসীর বিরুদ্ধে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

দমনীতির নামে একটা নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। পরের পাঁচ মাস ছিল একটি বিদেশী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গোটা দেশবাসীর সার্বিক জন-যুদ্ধ। দেশের দুই মাস ছিল এটা জনসমর্থনহীন পাকবাহিনী সমর্থিত ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ । (১৩) ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসম্বেরে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশে নামক একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

৩.২ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসেন। পরের দিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর এক আদেশ বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার স্থলে দেশে সংসদীয় পদ্ধতিরে সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং তিনি হন এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। শীঘ্রই ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা ঘোষণা করা হয়, যাতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্প এবং তাজউদ্দিন আহমদকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হলেন দেশের রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় লাভের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৬ মার্চ পূর্বের মন্ত্রিসভায় সামন্য রদবদল করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি মাত্র বৈধ জাতীয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি এবং সংসদীয় ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হলে, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫ আগষ্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি সে পদেই বহাল ছিলেন।

৯ মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের প্রায় সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমুদ্রবন্দর ধ্বংস বা ব্যবহারের অনুপযোগী করে দেয়। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, ঘরবাড়ি, খাদ্য গুদাম, গ্রামের হাটবাজার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস বা বিনষ্ট করে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হন, ১ কোটি বাঙালি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনেক মুক্তিযোদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

চিরতরের জন্য পঙ্গু হয়ে যান। দায়িত্বভার গ্রহণের পরপর বঙ্গবন্ধু সরকারকে এসব পুর্নগঠন-পুর্নবাসন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যেসব সেনা সদস্য বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তাদের সে দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হয়।

৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, খাদ্য মজুত বলতে কিছুই ছিল না। জাতিসংঘের এক হিসাব অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষয়- ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১.২ লক্ষ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এর উপর '৭২ সালের দীর্ঘ স্থায়ী খরা, '৭৩ সালের প্রলয়ংকারী সাইক্লোন এবং '৭৪ সালের দীর্ঘ ইসরাইল যুদ্ধের ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্যের উর্ধ্বগতি এসবের বিরূপর প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে অনেক অস্ত্র জমা দেন। তারপরও বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র রয়ে যায়। ফলে সশস্ত্র ডাকাতি, লুটতরাজ, ছিনতাই ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযুদ্ধে মধ্যদিয়ে মানুষের প্রত্যাশা যে আকশচুম্বী হয়ে ওঠে তা সহজে পূরণীয় ছিল না। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এর মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনী ছিল অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ। স্বাধীনতার পর বাম নামধারী চীনপন্থী কিছু গোপন সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'অসমাপ্ত বিপ্লব' এবং মুজিব সরকারকে রুশ-ভারত কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া 'অবৈধ সরকার' বলে প্রচার করতে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা-ই স্বীকার করে নেয় নি। এরা সংসদীয় রাজনীতিতে আদৌ বিশ্বাসী ছিল না। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টিসহ সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের নামে এসব উগ্র সংগঠন গোপন তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে ৫ মাসেই এদের হাতে ৬০টি থানা আক্রান্ত হয় এবং সকল অস্ত্র লুট হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি দল আওয়ামী লীগের ৪ জন এমপিসহ ৩ হাজার নেতা-কর্মী সন্ত্রাসীদের হত্যার শিকার হন। এক কথায় এরা সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরনের অঘোষিত যুদ্ধ ছুড়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ৩১ আক্টোবর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একটি অংশের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা মুজিব সরকারের জন্য এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জাসদের উদ্যোক্তারা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ধারা থেকে উঠে আসে এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে দলটি দ্রুত ছাত্র-তরুণ সম্প্রদায়কে বিপুলসংখ্যায় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অনেকে সরকারের বিরুদ্ধে একটি জঙ্গি প্লাটফরম হিসেবে জাসদের ব্যানারে সমবেত হয়। শীঘ্রই জাসদ সারাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত ও অস্থিতিশীল করে তুলে।

মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী দেশী-বিদেশী শক্তি '৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকাতে ব্যর্থ হলেও, স্বাধীনতার পর তারা নতুন এ রাষ্ট্র এবং মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ব্যাহত এবং সরকারকে অসফল করার উদ্দেশ্যে এরা নানা নাশকতামূলক তৎপরতায় মদদ দেয়। ১৯৭৪ সালে তীব্র খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দেয় সত্ত্বেও চুক্তি মোতাবেক খাদ্য বোঝাই বিদেশী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি এসে আন্তর্জাতিক চক্রান্তে ফিরে যায়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে বিদেশী ষড়যন্ত্র যুক্ত ছিল তা এখন স্পষ্ট।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সরকার হার্ডিঞ্জ ও ভৈরব ব্রিজসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি নতুন ফেরী, ১৮৫১ টি রেলওয়ে ওয়াগন ও যাত্রীবাহী বগী, ৪৬০টি বাস, ৬০৫টি নৌযান ক্রয় এবং চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর থেকে মাইন উদ্ধার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে। বঙ্গবন্ধু সরকার ভারতে আশ্রয় নেয়া ১কোটি লোককে দক্ষতার সঙ্গে পুর্নবাসন করে। মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারকে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার্থে বিদেশে প্রেরণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করে। সরকার পাকিস্তানে আটকাপড়া ১ লক্ষ ২২ হাজার বাঙ্গালিকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর থেকে ৩ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিশ্বে একটি নজির স্থাপন করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের কারণেই এতো স্বল্প সময়ে এটি করা সম্ভব হয়। দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি সংবিধান

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়ন বঙ্গবন্ধু সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব। উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ৯ বছরেও সে দেশ একটি সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি। দেশে ফিরে এসে সরকারের দায়িত্বভার গ্রহনের পর কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার স্থলে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল একটি বাস্তবানুগ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এর ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার পক্ষের এ দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবির বাস্তবায়ন ঘটে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল পাকিস্থানী রাষ্ট্র কাঠামোয়, বাংলাদেশে নয়- বিরোধী মহলে এরকম গুঞ্জন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গঠনের মাত্র ১৫ মাসের মধ্যে ১৯৭৩ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশেল প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ টি আসন পেয়ে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী বিমান বাহিনীসহ সদ্য স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পুনর্গঠিত করে। কুমিল্লার দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী স্থাপন করা হয়। পুলিশ, বি.ডি.আর, আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামোও গড়ে তোলা হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়। এ ছিল মুজিব সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কিন্তু পরবর্তী শাসনামলে তা আর রক্ষা করা হয় নি।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ২ কোটির মতো লোক মারা যাবে বলে আন্তর্জাতিক মহল থেকে আশঙ্কা করা হয়েছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দিলেও, ভায়াবহ রূপ নেয়ার পূর্বেই সরকার তা ঠেকাতে সক্ষম হয় (সরকারি মতে, এ দুর্ভিক্ষে ২৭,৫০০ লোক প্রাণ হারায়)।

বঙ্গবন্ধু সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন

Dhaka University Institutional Repository

বাতিল করে গণতান্ত্রিক অধ্যদেশ '৭৩ প্রণয়ন করে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও কয়েক লক্ষ শিক্ষককে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশ এ সময়ে দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একের পর এর সাফল্য অর্জন করে। শুরু থেকে বাংলাদেশের জন্য জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ ছিল একটি সঠিক সিদ্ধান্ত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের জন্য পাকিস্তানসহ বিশ্বের কিউসেক পানি প্রাপ্তির ব্যবস্থাসহ ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বাঙ্গালিদের মহিমান্বিত করেন। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৭৩ সালে তাঁকে 'জুলিও কুরি' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক একটি মাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল গঠনের পর দ্রুত দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির লক্ষ্যনীয় অবনতি হয়, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা দুরীভূত হয়। ঠিক এমনই সময় সংঘটিত হয় ১৫ আগস্টের নির্মম, নৃশংস হত্যাকান্ড। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। যদিও সেনা বাহিনীতে চাকরিরত এবং বিভিন্ন সময় চাকরিচ্যুত কিছু দেশী-বিদেশী শক্তি ও এদের প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগীগোষ্ঠীর যে সংশ্লিষ্টতা ছিল, তা এখন বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায়। এ ছিল একটি ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক একটি মাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল গঠনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সাময়িক বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। বস্তুত মুজিব হলেন প্রাক্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দু'পরাশক্তির মধ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' জনিত বিশ্ব রাজনীতির নির্মম শিকার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের একটি বিশেষ সঙ্কটের সময় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের কর্ণধার হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন দেশের সংবিধান স্থগিত ছিল। জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সংস্থা ছিল খুব দুর্বল এবং সৈন্যবাহিনী ছিল বহুধাবিভক্ত। বেসামরিক প্রশাসকগণ ছিলেন অসন্তুষ্ট আর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল হতাশা ও নেতৃত্বের যুদ্ধ। এমতাবস্থায় তিনি দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষ দূর করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর ক্ষমতা বৈধকরণের বিভিন্ন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। জিয়াউর রহমানের পাঁচ বছর শাসনামলে তিন বছর দশ মাস একুশ দিন সামরিক আইন (১৫.০৮.১৯৭৫ হতে ০৬.০৪.১৯৭৯) প্রবর্তিত ছিল। এ সময়ে ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন করে রাজনৈতিক দল রেজিষ্ট্রিকরণের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে ঘরোয়া রাজনীতি পরিচালনার সুযোগ দেয়া হয়। সরকার তখনো এমন কোনো গণবিরোধী নীতি গ্রহণ করেনি যার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে রাজনীতির চর্চা জমজমাট হয়ে উঠেনি। উপরন্তু তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর গণসমর্থন ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইতোমধ্যে ১৯৭৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির গণভোট অনুষ্ঠান, ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন বিধিবদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতা ও কার্যাবলীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বৈধতা ও নিরাপত্তা লাভ করে করেন। এ সময়ের মধ্যে জিয়া সরকারের গৃহীত কার্যাবলীতে গণবিরোধী কিছু না থাকায় বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে সরকার সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মনোভাব দেখা যায়নি।

১৯৮০ সালের শুরুতেই জাতীয় সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ সংসদের সার্বভৌমত্ব এবং সংসদ সদস্যদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে কতিপয় অভিযোগসহ ২৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন। তাদের মতে, বর্তমান ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে একব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন রাখা হয়েছে। সংসদকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন আদেশ,

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। সংসদ অধিবেশনে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ না দেয়া শুধুমাত্র নিজদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গণবিরোধী আইন পাস করা হচ্ছে। এ অবস্থায় সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ (৭৭+১৭) জন এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে কতিপয় দাবি উত্থাপন করেন এবং তাদের দাবির সমর্থনে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে সংসদের অধিবেশন বর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা তাদের দাবিনামা নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও দেখা করেন। কিন্তু তাদের ঐক্যে ফাটল ধরার কারণে এ বিরোধীদলীয় আন্দোলনে কোনো ফল হয়নি।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে সরকার জাতীয় সংসদে উপদ্রুত এলাকা বিল উত্থাপন করেন। এ বিলে সরকারকে দেশের কোনো অংশকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে সেখানে কার্যরত বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকদের নিয়োগ করার ক্ষমতা চাওয়া হয়। এ ধরনের এলাকায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোনো অফিসার বা পুলিশের কমপক্ষে সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে গণশৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেআইনী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে গুলি করার ক্ষমতা লাভ করেন। বেআইনী কার্যকলাপ বলতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, নিরাপত্তা কিংবা গণশৃঙ্খলা প্রতি ক্ষতিকারক কার্যকলাপক বুঝানো হয়েছে। উপদ্রুত এলাকায় বেআইনী কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয় এবং অপরাধের বিচারের জন্য প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিলটির পক্ষে সংসদে বলা হয় যে, অস্বাভাবিক আইনের দ্বারা সফলতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই এ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিলটি সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তারা বিলটিকে মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী বলে অভিহিত করেন এবং এটি পেশ করার প্রতিবাদে সংসদ অধিবেশন হতে ওয়াকআউট করেন। সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা বিলটিকে সামরিক আইনের চেয়েও জঘন্য বলে মন্তব্য করেন। সংসদের সমস্ত বিরোধীদলীয় সদস্যগণ বিলটিক জঘন্য ও পীড়নমূলক বলে অভিহিত করে এবং তা বাতিলের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি

Dhaka University Institutional Repository

জানান। সংসদে যাতে এ বিল পাস না হয় সেজন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতি আবেদন জানান। এভাবে উপদ্রুত এলাকা বিলটির বিরোধিতায় সমগ্র দেশটির বিরোধিতায় সমগ্র দেশব্যাপী প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন মাথাচারা দিয়ে উঠতে থাকলে সরকার বিলটিকে সংসদের একটি স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করেন। তবে এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে সরকারের তরফ হতে আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে বিলটি এখানে শেষ হয়ে যায়।

সুতরাং জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশে বিরোধীদলীয় রাজনীতি তেমন সাড়া জাগানো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ জিয়াউর রহমান ময়দানে রাজনীতির পরিবর্তে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। নিজে সব ধরনের দুর্নীতি, দলাদলি ও অপকর্মের উর্ধ্বে থেকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করাই ছিল তার ঐকান্তিক আশা।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এরশাদ সরকারের আমলে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ তৎকালে বাংলাদেশে বিরোধীদলীয় রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বস্তুত এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর একক এবং জোটবদ্ধ সংগ্রামের ফলেই গণতন্ত্র উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন, যে, "আমার চরম ও পরম লক্ষ্য হলো দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যথাশ্রীঘ্র সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে" ওই বছরের শেষার্ধেই রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়। তারা নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করতে থাকে। এদিকে ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইন লঙ্ঘন করে আন্দোলন হলে সরকার এ বিক্ষোভ কঠোর হস্তে দমন কর। অনেককে গ্রেফতার করা হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসবের ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। একটি জোট গঠিত হয় ১৫টি দলকে নিয়ে এবং আরেকটি জোট গঠিত হয় ৭টি দলকে নিয়ে। ১৫ দলের নেতৃত্ব দেয় আওয়ামী লীগ আর ৭ দলীয় জোটের নেতৃত্ব দেয় বিএনপি। দুই জোট সাধারণভাবে ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এ ৫ দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো ছিল একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় সংসদের নির্বাচন, সামরিক আইনের অবসান ইত্যাদি। এ দুই জোটের সঙ্গে যোগ দেয় আরও কিছু দল যেমন জামায়াতে ইসলাম। দুটি জোট আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। আন্দোলনের চাপে এরশাদ সরকার ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া এবং নভেম্বর মাস থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে। নভেম্বর মাসে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হলে বিরোধী দল ও জোটসমূহ ১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি নেয়। ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের অবস্থানকে কেন্দ্র করে দেশ চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। তখন সরকার রাজনৈতিক তৎপরতা আবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। এ পর্যায়ে ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ১৫ ও ৭ দল এ সরকারি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দাবি করে। বিরোধী জোটের আন্দোলনের ফলে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। এরপর সরকার পরিকল্পনা নেয় যে, রাষ্ট্রপতি ও সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মে। বিরোধী জোট দুটি সরকারের এ পরিকল্পনা ও প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তারা জাতীয় সংসদের নির্বাচন দাবি করে। এ বিরোধের মুখে সরকার ঘোষণা করে যে, বিরোধী দলের দাবি অনুসারে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর। কিন্তু বিরোধী জোটগুলো সরকারের নির্বাচনের এ পরিকল্পনাও বাতিল করে দেয়। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং ওই সময় বিরোধী জোটের কিছু শর্ত মেনে নেন এবং ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু এবারও বিরোধী জোটসমূহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হলো না। শুরু করল জোর আন্দোলন। ফলে জেনারেল এরশাদ ১ মার্চ সামরিক আইনের বিধিসমূহ কড়াকড়িভাবে পুনঃআরোপ করেন। ইতি বৎসরে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোট এবং ১৬ ও ২০ মে উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার গণরায় লাভ করেন।

এরপর মে মাসে দেশে প্রথমবারের মতো উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যেই ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয়া এবং ১ জানুয়ারি থেকে অবাধ রাজনীতি চালু হয়। দশ মাস পরে আবার অবাধ রাজনীতি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতির আসর গরম হয়ে উঠে এবং অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে নির্বাচনই প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। সামরিক আইনের অবসান ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে দুই বিরোধী জোট ও জামায়াতে ইসলাম আন্দোলন তীব্রতর করার উদ্যোগ নেয়। লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সভা, মিছিল, হরতাল ও সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির পথ বেছে নেয়। এ প্রেক্ষাপটেই সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এবারও পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা না দিলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। এরশাদ ঘোষণা করলেন যে যদি বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তবে তিনটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এগুলো হলো মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করবেন। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত করা হবে এবং সামরিক আদালতসমূহ তুলে নেয়া হবে। কিন্তু ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলাম রাষ্ট্রপতির ভাষণকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তাবিত নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা ২৬ এপ্রিলের সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার ও সংকল্প প্রকাশ করে। ৮ মার্চ দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় এবং জোট মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ ২২ মার্চ সারাদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে।

কিন্তু ১৯৮৬ সালের ২১ মার্চ জেনারেল এরশাদ হঠাৎ করে জাতির সামনে এক বেতার ভাষণে বলেন, যে, বিরোধী দলগুলো রাতারাতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত না নিলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুবিধার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বিরোধী দলের কয়েকটি শর্তও মেনে নেয়ার কথা বলেন। এ ভাষণের পরপরই ওই রাতেই ১৫ দলীয় জোট নেতা হাসিনা ঘোষণা করেন যে, তারা এরশাদের নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণে করেছেন। কিন্তু ৭ দলীয় জোট নেতা খালেদা জিয়া কোনো সরাসরি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। ১৫ দলীয় জোটের এ সিদ্ধান্তের ফলে রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। ১৫ দলীয় জোট থেকে নির্বাচনে ৮ দলীয় জোট অংশ নেয়। বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যদলগুলো হলো, ন্যাপ, জাসদ (সিরাজ), ন্যাপ (মোঃ), সিপিবি ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল), সাম্যবাদী দল (তোয়াহা) এবং গণআজাদী লীগ এবং যারা বিপক্ষে ছিল তারা হলো জাসদ (ইনু), ওয়ার্কার্স পার্টি (মেনন) প্রভৃতি। তাছাড়া আরও যে সকল দল নির্বাচনের বিপক্ষে আন্দোলন করেছিল তারা হলো শাহ আজিজ বিএনপি; খন্দকার মোস্তাকের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, অলি আহাদের নেতৃত্বে ৬ দলীয় জোট এবং অন্যান্য কয়েকটি ছোটদল।

নির্বাচনের পর জুলাই মাসে জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু ওই অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেনি। অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রস্তুতি চলতে থাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের। জেনারেল এরশাদ চীফ অব স্টাফ এর পদ থেকে পদত্যাগ করলে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে ১৫ অক্টোবর। প্রধান বিরোধী জোটসমূহ এ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তথাপিও নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৭ম সংশোধনী পাসের মাধ্যমে ১১ নভেম্বর সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। কিন্তু সামরিক শাসনের অবসান ঘটলেও বিরোধী দল ও জোটগুলো এতে সন্তুষ্ট হয়নি। কারণ তাদের প্রকৃত কোনো দাবিই পূরণ হয়নি। সংসদের ৩য় অধিবেশন ডাকা হয় ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৭। ঠিক এর এক সপ্তাহ আগে ৭ দল ও ৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটি ১৫ দফা দাবি ঘোষণা করে যার মধ্যে অন্যতম ছিল সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণা করে। সংসদের বাইরে জোট সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি এরশাদের ভাষণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। কিন্তু এ ধরনের মিল থাকা সত্ত্বেও বিরোধী জোটগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারছিল না। ১৯৮৭ সালের ২৯ মার্চের ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি বিরোধী জোটের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। ১৯৮৭ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৮৭ সালের ১৭ জুন ৮ দল ৭ দল ও ৫ দলের লিয়াজোঁ কমিটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তথা এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে অনেকটা অভিন্ন মত পোষণ করেন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের ডাকে ২১ ও ৩০ অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই এরশাদ সরকার 'জেলা পরিষদ বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত করলে এবং মাত্র ৪ মিনিটে তা পাস হয়ে গেলে জাতীয় সংসদের বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, সিপিবি ন্যাপ, জাসদ (সিরাজ) এবং ওয়ার্কার্স পার্টির জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন এবং জামায়াতে ইসলামও জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। জেলা পরিষদ বিলের বিরুদ্ধে ১৩ জুলাই ৭ দল, ৫ দল ও জামায়াতে ইসলাম ঢাকা শহরে হরতাল পালন করে।

১৯৮৭ সালের ১৮ জুলাই ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে এক দফা দাবিতে অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সকল জোট ঐক্যজোট আন্দোলন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তিনি জোটের ২২ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত ৫৪ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়। এ হরতাল পালনের সময় কয়েকজন নিহত ও আহত হলে ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জুলাই রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে ৫ জন পুলিশসহ প্রায় ৩০ জন ব্যক্তি আহত হয়। সমগ্র দেশের জনগণ সরকারের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হয়। জনগণের এ ক্রমবর্ধমান রুদ্ররোষের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১ আগস্ট জেলা পরিষদ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোট ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস ধরে তিন জোটের সংগ্রামী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। ২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এক বৈঠকে বসে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সফল করে তোলা এবং আসন্ন ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। এর ফলে এরশাদ বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এ অবরোধ কর্মসূচি ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য ৮ নভেম্বর এরশাদ সরকার ঢাকা শহরে ৭ দিনের জন্য ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির সভা সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ৯ নভেম্বর শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া আবারও বৈঠকে বসেন এবং এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। এরশাদ সরকার রাজধানীমুখী সকল ট্রেন, বাস, লঞ্চ, নৌকা ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেন। কিন্তু জনগণ সরকারের শত বিরোধিতা ও বাঁধাকে অস্বীকার করে পায়ে হেঁটেই ঢাকা শহরে আসতে শুরু করেন। ১০ নভেম্বর সমগ্র ঢাকা শহর বিশেষ করে জিরো পয়েন্ট থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা একদিকে জাতীয় পার্টির সমর্থক ও পুলিশ বাহিনী। অপরদিকে জনগণের মধ্যে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বহু পুলিশ ও জনতা হতাহত হয়। এরশাদ সরকার ১২ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে অন্তরীণ করেন। এরফলে প্রায় সমগ্র নভেম্বর মাস ধরেই এরশাদ সরকার বিরোধী হরতাল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান গণঅসন্তোষ প্রশমনের জন্য ২৭ নভেম্বর রাতে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

৩১ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিরোধী দলগুলোকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু বিরোধী তিন জোট এরশাদ সরকারের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আলোচনা বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা অস্বীকার করে। তিন ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী দলের সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৮ ডিসেম্বর রাতে সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং ১০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশে সভা সমাবেশ আয়োজন করতে থাকে। ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামের এরূপ একটি সমাবেশে শেখ হাসিনা বক্তব্য প্রদান করতে উপস্থিত হলে জাতীয় পার্টির কর্মীগণ ও সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী জনতার

Dhaka University Institutional Repository

ওপর গুলি চালায়। ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসী প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে।

১৯৮৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয় তাতে বহু ব্যক্তি হতাহত হয় ও প্রাণ হারায়। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ এরশাদ সরকার জাতীয় সংসদ ও পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ এসব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। বিরোধী জোট ও দলসমূহও এ নির্বাচন বর্জন করে। তবে এ নির্বাচনে আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে 'একাত্তর দলীয় সম্মিলিত জোট' (কপ) ফ্রিডম পার্টি, ২৭ দলীয় ইসলামী জোট, ২৩ দলীয় জোট, জাসদ (সিরাজ), জনদল, বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতি দল অংশগ্রহণ করেন। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রহসনমূলক। প্রায় সকল জনগণই এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রহসনমূলক। প্রায় সকল জনগণই এ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে রাজধানীতে ৭ জন নিহত ও প্রায় তিন শতাধিক লোক আহত হয়। ১৯৮৮ সালের ১১ মে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে সংবিধানের 'অষ্টম সংশোধনী বিল' উত্থাপিত হয়। 'ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি কুমিলা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিরোধী জোট ও দলগুলো অষ্টম সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে।

নবম সংশোধনী উত্তর বাংলাদেশের রাজধানীতে পূর্বের ন্যায় সরকারি ও বিরোধী শিবিরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ছাপ পাওয়া যায়। ৫ দলীয় ঐক্যজোট স্বৈরাচার উচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, কৃষক ক্ষেতমজুর, তাঁতিসহ গ্রামীণ মানুষের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৯৮৯ সালের ২৯ জুলাই উপজেলায় অবস্থান ও বিক্ষোভ এবং ২১ আগস্ট দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের পূর্ববর্তী ৮ম সংশোধনী আংশিকভাবে বাতিল ঘোষিত হলে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বিরোধী দলগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থার ফলেই মূলত এ ধরনের পরিস্থিতির

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভব ঘটে। ১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর বিশাল জনসমাবেশ থেকে বিএনপি ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়ে এর পূর্বেই সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান। ৭ দলীয় জোটের কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে মুসলিম লীগ, জাগপা এবং ৬ দলীয় জোট। এর পাশাপাশি ২৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এদিকে বিএনপি ১৯৮৯ সালের ২৮ নভেম্বরের কর্মসূচিতে সরকারি বাঁধাদানের ফলে সকল বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে ৭ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমাবেশ থেকেই ২৯ ও ৩০ নভেম্বর ৩৬ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করেন। সে সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী, ৫ দল, ৬ দল, মুসলিম লীগসহ অন্যান্য জোট ও দলসমূহ হরতাল পালনের আহ্বান জানায়। ঢাকা মহানগর ফ্রিডম পার্টিও ২৯ ও ৩০ নভেম্বর হরতালের ডাক দেয়। এভাবে প্রায় সকল বিরোধী দলই হরতাল আহ্বান করায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ২৯ ও ৩০ নভেম্বরে দেশব্যাপী হরতাল সম্পূর্ণরূপে সফল হয়। সরককারের বিভিন্নমুখী হরতাল বিরোধী প্রচারণা সফল হয়নি। তবে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিরোধী দল ও জোটসমূহের অবস্থান ধর্মঘট ও হরতালকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে তার আচেঁ সরকার বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সবকিছুই নির্ভর করে বিরোধী দল ও জোটগুলোর আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ ও সুনির্দিষ্টভাবে সরকার পতনের দিকে পরিচালিত করার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার ওপর।

অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘ নয় বছর এরশাদ দেশে কর্তৃত্ববাদী নীতি অনুসারে দেশ শাসন করেন। অগণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজের ও নিজ দলের স্বার্থে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা চর্চা করার কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মধ্যে এরশাদ বিরোধী মনোভাব জন্ম লাভ করে। ১৯৮৭-৮৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী সরকার বিরোধী আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ৮ দলীয়, ৭ দলীয় এবং ৫ দলীয় জোট এ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ

Dhaka University Institutional Repository

গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। এ সময়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তা বাংলার রাজনীতিতে এক তাৎপর্যময় ঘটনা। ১৯৯০ সালের শুরুতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৫ দল, ৬ দল ও অন্যান্য কয়েকটি জোট একই রূপ কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্যদিকে ৮ দলীয় জোট ৭ দফা দাবি আদায়ের প্রস্তাব ঘোষণা করে। ৭ দলীয় জোট ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের দিবস ঘোষণা করেন।

সামনে আসে উপজেলা নির্বাচন, ডাকসু নির্বাচন। উপজেলা ও ডাকসু নির্বাচন বিরোধী আন্দোলন বিনির্মাণে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ওই সম্ভাবনা পরিষ্কার হয়ে উঠে এরশাদ সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট বিরোধী আন্দোলনে। সরকার ১৪ জুন যে নতুন বাজেট পাস করে তার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ জনপ্রতিক্রিয়ার গণআন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিরোধী ৩টি জোট বাজেট বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২৮ জুন দেশব্যাপী জোটগুলো ২৯ জুলাই ও ২৬ আগস্ট গণবিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচি ঘোষণা করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘোষণা সাধারণ জনগণের মধ্যে বিরাট আশাবাদ সঞ্চার করে। বিরোধী দলগুলো ও ১৯৯০ সালের ২০ নভেম্বর সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। ২৫ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ছাত্রঐক্য আন্দোলন চরম ধারণ করে। ২৭ নভেম্বর বিএম-এর যুগ্ম মহাসচিব ডা. সামসুল আলম মিলনের মৃত্যুর পর দেশের দেশের সমস্ত চিকিৎসকরা অবিরাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই রাতেই এরশাদ সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ২৯ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৩০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল দলীয় ঐক্যজোট আন্দোলনের যৌথ নির্দেশনাবলী ঘোষণা করে। ১ ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সকলেই কর্মবিরতি ঘোষণা দেন তথা পদদ্যাগ করেন। এভাবে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এরশাদের পদত্যাগের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

গণঅভ্যুত্থানের চাপে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অনুসারে বিরোধী দলগুলো সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দান করে। ৬ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন। ১২ ডিসেম্বর এরশাদ ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার কওে গুলশানের একটি গৃহে অন্তরীণ করে। ১৭ ডিসেম্বর এরশাদের দুর্নীতি তদন্তে একটি কমিশন গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ২ মার্চে (পরে তা সংশোধিত করে ২৭ ফেব্রুয়ারি করা হয়) সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ওই সময় থেকেই বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কেন্দ্রিক জোর তৎপরতা শুরু করে। এটা অনেকটা বিপ্লবতুল্য। অনেকের মতে ১৯৭১ সালে প্রথম বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর এটা ছিল দ্বিতীয় বিপ্লব ৭০ এর শেষ পর্যায়ে ইরানে এবং ৮০ দশকের মাঝামাঝি ফিলিপাইনের পর বিশ্বের খুব কম দেশেই এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনা ঘটেছে।

এরশাদের পতনের পর বিচাপরতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছোট বড় মিলিয়ে বহু দল এতে অংশগ্রহণ করে। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মধ্যে। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের প্রধান অঙ্গীকার ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অপরদিকে, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার পদ্ধতি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করে (দলীয় মেনিফেস্টো অনুযায়ী বিএনপি রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় বিশ্বাসী) জাতীয়তাবাদী শক্তির (বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ) ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, প্রধান দলগুলোর মধ্যে বিএনপি ১৪১ টি আসন (৩০.৮১% ভোট), আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী 'নৌকার' প্রার্থীরা ৯৮টি আসন (৩৪.২৯%), এরশাদের জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন (প্রায় ১২ ভাগ ভোট) এবং জামায়েত ইসলামী ১৮টি আসন (১২.১৩%) পায়। আওয়ামী লীগের ফলাফল অনেককেই বিস্মিত করে। কেননা

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগ যেখানে সুসংগঠিত ও ঐতিহ্যবাহী একটি রাজনৈতিক দল, সেখানে বিএনপি তখনও সাংগঠনিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অগোছালো ছিল। 'সূক্ষ্ম কারচুপি ও আঁতাতের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নিশ্চিত বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে' বলে নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মেখ হাসিনা দাবি করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগে বিরোধী সকল শক্তি যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, বিএনপি ও জামায়াতের নির্বাচনী সমঝোতা ছিল খুবই স্পষ্ট। নির্বাচতী ফলাফলেও তা প্রতিফলিত হয়। যাহোক, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বহু বছর পর এই প্রথম বাংলাদেশেল একটি সুষ্ঠ ও কার্যকর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেয়। আসলে, আওয়ামী লীগের বিরোধিতায় সকল দক্ষিণ-পন্থী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের খালেদা জিয়ার 'আপোষহীন নেত্রী'র যে ইমেজ গড়ে ওঠে, তার বিএনপি-র এর নির্বাচনে জয়ী হতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। পরের দিন খালেদা জিয়া ৩২ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে দুটি সংবিধান সংশোধনী আইন পাশ হয়, যথা একাদশ সংশোধনী ও দ্বাদশ সংশোধনী। দুটি বিলই একই দিন (৬ আগস্ট ১৯৯১) পাশ হয়। একাদশ সংশোধনী দ্বারা ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে বিল পাশের দিন পর্যন্ত বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সকল কার্যকলাপ ও গৃহীত ব্যবস্থা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। এছাড়া, সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও দায়িত্ব গ্রহণের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ যাতে তাঁর পূর্বের প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যেতে পারেন। এতে তারাও ব্যবস্থা হয়। ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর বিএনপি. প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস জাতীয় সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে বিচারপতি শিাহাবুদ্দীন স্বপদে ফিরে যান।

বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রে দ্বাদশ সংশোধনী একটি অত্যান্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য পূর্ণ পদক্ষেপ। এ দ্বারা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং যা এতদিন ধরে অব্যাহত ছিল, তদস্থলে '৭২-এর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের এ বিলটি দল নির্বিশেষে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯ নভেম্বরের তিন জোনের রূপরেখায় (১১৯) সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছিল। নির্বাচনের পর পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ আওয়ামী লীগ সদস্য ও বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ এ মর্মে একটি বিল উত্থাপনের নোটিশ দেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হলেও, বিএনপি (এবং জাতীয় পার্টিও) জাতির রাজনৈতিক ইচ্ছা বা অভিব্যক্তির কাছে নীতি স্বীকার করে এবং সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনে সম্মত হয় । বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পাঁচ বছরের শাসন আমলে এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

দ্বাদশ সংশোধনী পাশের সময় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। শীঘ্রই উভয় পক্ষের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব-বিরোধ। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের ১১টি শূন্য আসনে (একাধিক আসনে বিজয়ী সদস্যদের অতিরিক্ত আসন ছেড়ে দেয়ার কারণে) উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা, নির্বাচনকে ক্ষুণ্ন করে। ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে সংসদের পধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। এর ওপর ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে বিএনপি ১৬৮-১২২ ভোটে জয়ী হলেও (উভয় পক্ষের অনেক নানা করণে উপস্থিত থাকতে পারে নি), সরকারের জন্য এটি ছিল একরূপ রাজনৈতিক ধাক্কা। এ ধাক্কা কাটিয়ে ওঠতে মৃত্যুজনিত কারণে এ আসন শূন্য হয়। ১৯৯৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী জয়ী হয়। নির্বাচন শেষে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল আওয়ামী লীগ সরকারি হস্তক্ষেপে নির্বাচনী রায় সরকারি দলের পক্ষের উল্টে দেয়ার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রতিবাদ স্বরূপর আওয়ামী লীগের আহ্বানে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। এই উপনির্বাচনে সরকারের অবস্থায় নিরপেক্ষ ছিল এ কথা আদৌ বলা

Dhaka University Institutional Repository

যাবে না। ১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থী হেরে গেলে এ প্রতিশোধে সংঘটিত হয় লালবাগ হত্যাকাণ্ড।

তত্ত্বধায়ক সরকারের আন্দোলনে ১৯৯৪ সালের ২০ ই মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুরা ২ আসনের উপনির্বাচন ছিলো একটি মোড় ফেরানো ঘটনা। এ আসনে আওয়ামী লীগ সাংসদের মৃত্যু হলে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী ফলাফল অনুযায়ী নির্বাচনে বি এন পি প্রার্থী জয়ী হন। সরকারী ছত্রছায়ায় ব্যাপক কারচুরি, সন্ত্রাস ও অনিয়ম ঘটে। এরপর আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিলোধী দলের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলব্ধি জন্মে যে, বি এন পি সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ হবেনা। তাই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনা জোরালোভাবে সম্মুখে নিয়ে আসে। ১৯৯৪ সালের৩০ মার্চ থেকে একটানা সংসদ বর্জন শেষে একই বছর ২৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত সহ বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য একযোগে তাঁদের পদত্যাগের কথা ঘোষনা করেন। অবশেষে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপ্রতি সংসদ ভেঙ্গে দেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের সর্বাত্নক বয়কাট ও প্রতিরোধের মুখে প্রায় ভোটারবিহীন ও সন্ত্রাসপূর্ণ এক পরিবেশে একদলীয় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের কার্য দিসব ছিল মাত্র ৪ দিন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটি একটি রেকর্ড। এক বিস্ফোরোন্মুখ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীয় আইন পাশ হয়। প্রধানমন্ত্রী হয়েও বেগম খালেদা জিয়ার প্রায় (১৯৯১-১৯৯৫) বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা, প্রশাসনের দলীয়করণ, নিকট আত্মীয় স্বজন, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং দলের অন্যদের অনিয়ম ও দূর্নিতীর আশ্রয় নিয়ে রাতারাতি অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না ঘটা, তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী বেতার ও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত না করে এই পরিবর্তে দলীয় প্রচারণ হিসেবে এসবের ব্যবহার, সুষ্ঠভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে মানুষ বিএনপি সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। একটি অভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিরি উদ্ভব হলে ৩০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া তার সরকারের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্ঠা নিয়োগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের পতনের পর বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বধানে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ বছর পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব পড়েত বাধ্য। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছরের মেয়াদ পূরণ হয় ২০০১ সালে।

শেখ হাসিনা সরকারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, নির্দলীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মদকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন আওয়ামী লীগ সরকারে একটি যুগান্তাকারী সিদ্ধান্ত।

২. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে একের পর এক সন্ত্রাস ও কারচুপিপূর্ণ, প্রায়-ভোটারবিহীন, প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে দীর্ঘদিন দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উপনির্বাচনে (মানিকগঞ্জ, বরিশাল) ১২ জুনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা কমবেশি অব্যাহত রয়েছে। ফলে নির্বাচন কমিশনসহ সমগ্র নির্বাচন ব্যবস্থা জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে।

৩. আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছিল যে, জাতীয় সংসদ হবে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের প্রাণকেন্দ্র। সংসদীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ইতোমধ্যে সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে, মন্ত্রীদের স্থলে সংসদ সদস্যদের চেয়ারম্যান করে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠন, সংসদ চলাকালে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সপ্তাহে একদিন প্রশ্ন উত্তর পর্ব চালু এবং ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হত্যাকারীদের ভবিষ্যতে বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়া উদ্দেশ্যে খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ২৬

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর জারিকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি এতদিতন একটি জঘণ্য কালো আইন হিসেবে বিদ্যমান ছিল ।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয়দের কেন্দ্র করে আমাদের দেশে দীর্ঘ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দু' দশকেরও অধিক সময় ধরে তা সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নেয়। বিগত দিনে বিভিন্ন সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেও এর স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় অঙ্গীকার, সদিচ্ছা ও রাষ্ট্রানায়কোচিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে ৩-৬ মে ১৯৯৮ জাতীয় সংসদে চারটি বিল পাশ হয়েছে।

৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ

১. জামায়াতে ইসলামী: ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট সৈয়দ আবুল আ'লা মওদুদী কর্তৃক জামাই-ই-ইসলামী হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানিয়ে জামায়াত জনসমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালায়। জামায়াত পূর্ব পাকিস্তানে তেমন সাড়া জাগাতে বা আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি এবং ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সবগুলো ইসলামী দল মিলিতভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মাত্র একটি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। তবে ১৯৭৬ সালে অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই দলকেও পুনরুজ্জীবিত করার অনুমতি দেওয়া হয়। আশির দশকে এই দলটি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয় এবং কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এই দলের শক্তিশালী সমর্থন রয়েছে।

২. আওয়ামী লীগ: ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকেই দলের ভেতরেই রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীলদের মধ্যে বিরোধ চরম রূপ পরিগ্রহ করে। প্রগতিশীল অংশ ১৯৪৯ সালের জুন মাসের ২৩-২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (ই.পি.এ.এল) গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই দলের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে যৌথভাবে দলের যুগ্ম সম্পাদক হন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের শামসুল হক। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (এ.পি.এ.এল) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত এই দলের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। শুরু থেকেই এই দলটির ভেতর দুটি সুনির্দিষ্ট মতধারার অনুসারীদের উপদল ছিল; এর একটি ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মার্কিনপন্থী ধারা এবং অপরটি ছিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণমুখী বামপন্থী ধারা। এই মতপার্থক্যগত বিরোধ ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে দলটিকে আরও একটি ভাঙনের দিকে ধাবিত করে, যখন মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন।

১৯৬২ সালের ৪ অক্টোবর গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের (এন.ডি.এফ) একটি অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। তবে ১৯৬৪ সালের ২৫-২৬ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে পূর্ব পাকিস্তানে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটে এর কিছু দিন আগেই। একই বছর মার্চ মাসে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হলেও এটি একটি দলীয় ইশতেহার প্রণয়নে ব্যর্থ হয় এবং কার্যত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ একটি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন রাজনৈতিক দল হিসেবে এর কর্মকাণ্ড শুরু করে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্যের বিষয়টি ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী/শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর তেমন কোন নেতার আবির্ভাব ঘটে নি, যিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুই প্রাদেশিক অংশের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারতেন। এই পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর

Dhaka University Institutional Repository

রহমান পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক গতিধারা অনুধাবন করে ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। কিন্তু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে মূখ্যত ছাত্রদের নেতৃত্বে সংঘটিত একটি গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো নির্বাচনের এই ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে বাংলাদেশে সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা শুরু করে। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং বন্দি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান এবং ১৯৭১ সালের ৫-৬ জুলাই তারিখে দলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাখা হয়। তাঁরা ইতিমধ্যেই ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। কিন্তু দেশের ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামের একটি দল গঠনের মাধ্যমে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত এক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে আওয়ামী লীগের এই অধ্যায়টির অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালে আওয়ামী লীগ নামে এই দলটি এর কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু করে। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে বহু ব্যক্তি এবং অনেকগুলো উপদল আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পৃথক পৃথক দল গঠন করে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে- আতাউর রহমান খান কর্তৃক গঠিত জাতীয় লীগ (১৯৭০); জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ, ১৯৭২); জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জনতা পার্টি (১৯৭৬); আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বাধীন গণ আজাদী লীগ (১৯৭৬) এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন গঠিত বাংলাদেশ ডেমোক্র্যাটিক লীগ (১৯৭৬)।

শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগ চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। আওয়ামী লীগের অবশিষ্ট নেতৃবৃন্দ দলত্যাগী গ্রুপ ও উপদলসমূহকে পুনরায় একত্রীকরণের মাধ্যমে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলটিকে চাঙ্গা করে তোলেন। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)-এর ১৪০টি আসনের বিপরীতে এই দল ৮৮টি আসন পেয়েছিল। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ১১৬টি আসনের বিপরীতে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসনে জয়লাভ করে এবং এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনে সমর্থন দেয়।

৩. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি: পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেশের পররাষ্ট্র নীতি এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে বিরোধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষক ও শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী জননেতা ভাসানী এ সময় এইচ.এম সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর আমেরিকাপন্থী পররাষ্ট্র নীতি এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সমর্থন দানের ক্ষেত্রে উদাসীনতার জন্য দায়ী করেন। এই মতবিরোধ অবশেষে আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি ভাঙন সৃষ্টি করে এবং ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের মধ্যকার বামধারার মনোভাবসম্পন্ন নেতা-কর্মীদের সমর্থন নিয়ে মওলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। ভাসানী নব গঠিত এই

Dhaka University Institutional Repository

দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন। দলটি গঠন করার অব্যবহিত পরে এবং এরপর ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে পুনরুজ্জীবনের পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তবে চীন-সোভিয়েত বিরোধের কারণে ১৯৬৭ সালে দলটি ন্যাপ (ভাসানী) এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ (ওয়ালী) এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন চীনপন্থী দলের বিপরীতে মস্কোপন্থী ন্যাপ সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে শক্তিশালী ছিল। মওলানা ভাসানী একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনে তাঁর দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের বিরোধিতাকারী সর্বপ্রথম দলও ছিল এটি। কিন্তু ১৯৮৮ সালে এই দলটি ১৩টি পৃথক পৃথক দল এবং উপদলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। মস্কোপন্থী ন্যাপও অনুরূপভাবে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশক জুড়ে একটি ভাঙন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কমপক্ষে ৫টি দল এবং উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৪.কমিউনিস্ট পার্টি: ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সি.পি.আই) দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.পি) গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিও (ই.পি.সি.পি) ঢাকায় দপ্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে একই সময়ে গঠিত হয়। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এর তেমন একটা সংযোগ ছিল না। দলটি অনেকটা গোপন সংগঠনের মতোই এর কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়, যদিও ১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (ই.পি.সি.পি) ১৯৬৬ সালে মার্কসবাদী-লেলিনবাদী (এম.এল) বা চীনপন্থী এবং সোভিয়েত পন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আবার ১৯৭০ সাল নাগাদ এম.এল মোট চারটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন: ই.পি.সি.পি (এম.এল), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (ই.বি.সি.পি), কোঅরডিনেশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভলুশন্যারীজ (সি.সি.সি.আর) এবং পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন (ই.বি.ডব্লিউ.এম)। সময়ের বিবর্তনে এই দলসমূহ মূলত ছোট ছোট অনেকগুলো সশস্ত্র সংগঠন অথবা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বর্তমানে এ ধরনের সর্বমোট ১৮টি দলের পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি): সত্তরের দশকের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রাপ্ত একটি দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই দল দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে জয়ী হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বেশ কিছুসংখ্যক নেতা এতে যোগ দিলে দলটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন। এরপর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে সংঘটিত অপর একটি সেনা অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরী প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারও ক্ষমতাচ্যুত হন।

নেতৃত্বের প্রশ্নে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যখন বি.এন.পি (সাত্তার), বি.এন.পি (হুদা) এবং বি.এন.পি (দুদু) এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তখন এটি সংকটের মুখে পড়ে। পরবর্তীকালে বি.এন.পি দুদু গ্রুপ প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল রূপে আবির্ভূত হয়। জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অবারিত এবং নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করলে বি.এন.পি হুদা গ্রুপের নেতা শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জনদলে যোগ দেন। অপরদিকে বি.এন.পি সাত্তার গ্রুপ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নিজেদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মতপার্থক্যের কারণে শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে অপর একটি ক্ষুদ্র অংশ এই দলটি ত্যাগ করে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি সুসংহত হয় এবং আশির দশকের শেষদিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৮৮টি আসনের বিপরীতে এই দল ১৪০টি লাভ করে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বি.এন.পি ১১৬টি আসন লাভ করেছিল। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সংসদের দুই তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.জাতীয় পার্টি (জে.পি): ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে চেয়ারম্যান করে গঠিত রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রাপ্ত একটি মধ্যপন্থী দল। ১৯৮৬ সালের মে মাসে এবং এরপর ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে এই দল সহজেই বিজয় অর্জন করে, যদিও বলা হয় যে, দুটি নির্বাচনেই ব্যাপক ভোট কারচুপি হয়েছিল। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করেত বাধ্য হন এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৯১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দেশের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে জয়ী হয়ে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। জাতীয় পার্টি এখন নেতৃত্বের প্রশ্নে জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (আনোয়ার হোসেন মঞ্জু) এবং জাতীয় পার্টি (নাজিউর রহমান মঞ্জু) এই তিন ভাগে বিভক্ত।

৭.জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ): বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর একটি বামপন্থী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ভাঙন থেকেই এর উৎপত্তি। সিরাজুল আলম খান এবং আ.স.ম আব্দুর রবের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের বামপন্থী অংশটির হাতেই ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের গোড়াপত্তন হয় এবং মেজর (অব.) এম.এ জলিল ও আব্দুর রব দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক হন। দলটির লক্ষ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং কৃষক-শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করার মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই দলটি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে এটি একটি গণবাহিনী গঠন করে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে এই দল সরকার বিরোধী প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। জাসদ জনগণের বিপ্লবী সেনাবাহিনী নামের আড়ালে সেনাবাহিনীর মধ্যে নিজস্ব কিছু গোপন সেল গঠন করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান এবং একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের পর এই দলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের নেতৃত্বে একটি 'বিপ্লব' সংঘটিত করারও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সরকার দলটির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এর বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খালেকুজ্জামান ভূইয়ার নেতৃত্বে জাসদের একটি অংশ দলত্যাগ করে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। দলটি নিজেদের প্রকৃত মার্কসবাদী-লেলিনবাদী রাজনৈতিক দল বলে দাবি করে। ১৯৮২ সালে বাসদও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি অংশের নেতৃত্বে থাকেন খালেকুজ্জামান ভূইয়া এবং অপর অংশের নেতৃত্ব দেন আ.ফ.ম মাহবুবুল হক। ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্তে জাসদও তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১৯৮৬ সালে জাসদ (সিরাজ) এবং জাসদ (ইনু) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আরও এক দফা ভাঙনের মধ্য দিয়ে জাসদ (রাজা) নামে আরও একটি পৃথক রাজনৈতিক দল জন্ম নেয় এবং এটি ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

৮.ইসলামী ঐক্যজোট (আই.ও.জে): ১৯৯০ সালে খেলাফত মজলিস, নেজাম-ই-ইসলাম, ফারায়জি জামাত, ইসলামী মোর্চা, উলেমা কমিটি, ন্যাপের (ভাসানী) ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন-এই সাতটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে খেলাফতের আদর্শে একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। ইসলামী ঐক্যজোটের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে জোটভুক্ত প্রতিটি দল থেকে পাঁচ জন করে সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি মজলিশ-ই-শুরা এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট একটি মাত্র সংসদীয় আসন লাভ করে।

৯. গণ ফোরাম: প্রখ্যাত আইনজীবী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা কামাল হোসেন ১৯৯২ সালে গণ ফোরাম গঠন করেন। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি বাম উদারনৈতিক রাজনৈতিক দল। দলটি একটি শক্তিশালী সিভিল সমাজ এবং সমতার ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারে ইতিহাস

বাংলাদেশের পার্লামেন্ট প্রায় দেড়শত বছরের একটি পার্লামেন্ট। ব্রিটিশ বাংলার প্রথম পার্লামেন্ট অধিবেশন বসে ১৮৬২ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পার্লামেন্টারি রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রথম ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পর পাকিস্তানের এক দশকের (১৯৪৭-১৯৫৮) সংসদীয় রাজনীতি বাধাগ্রস্ত হয়। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্টকে চরম ক্ষমতা দিয়ে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাবার স্ট্যাম্প প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠার বিধান হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা আবার স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংসদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এবং ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী পাস করে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই ব্যবস্থা এখনও বিদ্যামান রয়েছে।

টেবিল- ৩ : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও তার কার্যকাল

সংসদ	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	কার্যকাল
প্রথম সংসদ	৭ এপ্রিল ১৯৭৩	৬ নভেম্বর ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয় সংসদ	২ এপ্রিল ১৯৭৯	২৪ মার্চ ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয় সংসদ	১০ জুলাই ১৯৮৬	৬ডিঃ ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ সংসদ	১৫ এপ্রিল ১৯৮৮	৬ ডিঃ ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম সংসদ	১৫ এপ্রিল ১৯৯১	২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
৬ষ্ঠ সংসদ	১৯ মার্চ ১৯৯৬	৩০ মার্চ ১৯৯৬	১২দিন
সপ্তম সংসদ	১৪ জুলাই ১৯৯৬	১৩ জুলাই ২০০১	৫ বছর
অষ্টম সংসদ	২৮ অক্টোবর ২০০১	২৭ অক্টোবর ২০০৬	৫ বছর
নবম সংসদ	২৫ জানুয়ারি ২০০৯	-	-

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৪:বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে বিরোধী ও সরকারি দলের অবস্থান

জাতীয় সংসদ	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	নির্বাচনের বছর অবস্থান	সদস্যদের %			মোট সদস্য
			নির্দলীয়	সরকারি	বিরোধী		
প্রথম সংসদ	আ. লীগ	-	১৯৭৩	৯৭.৮	০.৬	১.৬	৩১৫
দ্বিতীয় সংসদ	বিএনপি	আ. লীগ	১৯৭৯	৭৫.২	২৩.৩	১.৫	৩৩০
তৃতীয় সংসদ	জাপা	আ. লীগ	১৯৮৬	৬২.৪	৩৪.৯	২.৭	৩৩০
চতুর্থ সংসদ	জাপা	সম্মিলিত	১৯৮৮	৮৩.৭	৮.০	৮.৩	৩০০
পঞ্চম সংসদ	বিএনপি	আ. লীগ	১৯৯১	৫০.৯	৪৮.২	০.৯	৩৩০
সপ্তম সংসদ	আ. লীগ	বিএনপি	১৯৯৬	৫২.৭	৪৭.৩	-	৩৩০
অষ্টম সংসদ	চারদলীয় ঐক্যজোট	আ. লীগ ও জাপা	২০০১	৭২	২৬	২	৩০০

উৎস : Nizam Ahmed : "The Parliament of Bangladesh", page-61

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও জাতীয় সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বাঙ্গালিরা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাথে পরিচিত থাকলেও পাকিস্তানি শাসনামলে তা কখনো বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়। এই নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় বাঙ্গালিরা অনেক সংগ্রাম করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালিরা রক্ত ঝরিয়েছে শুধুমাত্র শাসনকার্যে সার্বিক অংশগ্রহণের জন্য। দীর্ঘ ২৪ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার স্বপ্নে বিভোর হয়। যদিও ১৯৭১ সালের গণপরিষদ গঠন করা হয় তবুও এটার মূল লক্ষ্য ছিল সংবিধান প্রণয়ন। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আপোষহীন। অর্থ্যাৎ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বেই প্রথমে বাংলাদেশের মাটিতে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় এবং আওয়ামীলীগের নেতৃত্বেই ১৯৭৫ সালে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অনেক ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে বর্তমানে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু থাকলেও এর প্রতিবন্ধকতা কম নয়।

467516

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী "অস্থায়ী সংবিধান আদেশ" (Provisional constitution order) জারি করে বাংলাদেশ তিনি (মুজিব) সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর দেশে নতুন সংবিধান প্রণীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়। অর্থাৎ, বাংলাদেশে সর্ব প্রথম ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ১৯৭২ সালের এই সংসদীয় ব্যবস্থার মূল হোতা ছিল আওয়ামীলীগ। তাই Moudud Ahmed লিখেছেন, "The Constitution of Bangladesh envisaged a west minister type of Parliamentary system, reflecting the aspirations of the people nurtured for nearly two decades. The Awami leagues Commitment since its inception for the establishment of a real living democracy for which they struggled and suffered for so many years could now

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

be fulfilled because of the absolute power of the Government (Ahmed, Moudud 1983).

চতুর্দশ সংশোধনীর পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অথপর ১৯৭১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র আবার চালু হয়।বাংলাদেশ জাতীয়

৪.২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন

একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য এবং ৪৫ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত মহিলা সদস্যরা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপ্রতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করতে পারবেন। কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদে প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সদস্য নিয়ে সংসদ নিম্ন লিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করেনঃ

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি

(খ) বিশেষ - অধিকার কমিটি এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রনালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারে। এছাড়া সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকে। সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৫ ঃ বাংলাদেশের ১ম-৮ম সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদের মেয়াদকাল, মোট অধিবেশন ও মোট কার্যদিবসের পরিসংখ্যান

অধিবেশন	মেয়াদকাল	মোট অধিবেশন	মোট কর্মদিবস
প্রথম সংসদ	২ বছর ৭ মাস	৮টি	১৩৪ দিন
দ্বিতীয় সংসদ	৩ বছর	৮টি	২০৬ দিন
তৃতীয় সংসদ	১ বছর ৫ মাস	৪টি	৭৫ দিন
চতুর্থ সংসদ	২ বছর ৮ মাস	৭টি	১৬২ দিন
পঞ্চম সংসদ	৪ বছর ৭ মাস	২২টি	৩৯৫ দিন
ষষ্ঠ সংসদ	৭ দিন	১টি	৪ দিন
সপ্তম সংসদ	৫ বছর	২৩টি	৩৮৩ দিন
অষ্টম সংসদ	৫	২৬টি	–

৪.৩ কমিটি ব্যবস্থাসমূহ

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব মূল্যায়ন এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড সমীক্ষার উদ্দেশ্যে সংসদ-সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই এ ধরনের সংসদীয় কমিটি রয়েছে। এ কমিটিগুলি জাতীয় সংসদ সদস্যদের কার্যত কর্মব্যস্ত রাখে; নিজেদের তারা সংসদের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এবং নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার ব্যাপারেও তারা সজাগ থাকেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদকে সরকারি অর্থ কমিটি এবং বিশেষ অধিকার কমিটিসহ

Dhaka University Institutional Repository

বেশ কিছু সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এসব কমিটির কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিল বিবেচনা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা এবং সঠিকভাবে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের বিষয় পর্যালোচনা করা। সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধিমালা দ্বারাই এসব কমিটির প্রায়োগিক দায়দায়িত্ব, সামগ্রিক কর্মতৎপরতা এবং কার্যপরিধি নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এসব কমিটির আওতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপ-কমিটি গঠনেরও বিধান রয়েছে। সংসদে স্থায়ী কমিটিগুলি হলো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি, অর্থ ও হিসাব নিরীক্ষা কমিটি এবং অপরাপর স্থায়ী ধরনের কমিটি। তবে বাছাই কমিটি ও বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত কমিটিগুলি এদের থেকে আলাদা।

স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হতে পারেন অথবা স্বয়ং স্পিকার তাদের মনোনয়ন দিতে পারেন। অর্থবিষয়ক কমিটি এবং বিশেষ অধিকার কমিটি, সরকারি আশ্বাস সংক্রান্ত কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধিমালা কমিটি ও বেসরকারি সদস্য বিল সংক্রান্ত কমিটিসহ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সংসদ নিয়োগ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে পিটিশন ও লাইব্রেরি সম্পর্কিত কমিটিসহ হাউজ কমিটি ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা স্পিকার কর্তৃক মনোনীত হন। কমিটিগুলির বৈঠক, তাদের আলোচনা ও শুনানি কার্যক্রম পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাংবিধানিকভাবেই সংসদ ইচ্ছা করলে আইন করে কোন সংসদীয় কমিটি বা কমিটিসমূহের উপর এমন ক্ষমতা ন্যস্ত করতে পারে, যে ক্ষমতাবলে সে কমিটি বা কমিটিসমূহ নির্দিষ্ট কোন ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি হাজির করতে বা সাক্ষীদের সশরীরে উপস্থিত হতে বাধ্য করতে পারে। সংসদীয় কমিটিগুলির বৈঠকের কোরাম গঠনের জন্য কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। বৈঠকের আলোচ্যসূচির উপর কমিটির উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যই সাধারণত বক্তব্য রাখেন। বৈঠকে কোন বিষয় নিয়ে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে পক্ষ ও বিপক্ষের ভোট সমান হলে বৈঠকের সভাপতি যেকোন পক্ষে তার কাস্টিং ভোট প্রদান করতে পারেন। কমিটিগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে এবং অধিবেশন চলাকালে সংসদে তা উপস্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী কমিটিগুলি দৈনন্দিন সংসদীয় কার্যক্রমসহ সংসদ সদস্যদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, নির্বাহী সরকারের অর্থ পরিচালন নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনার উপর নিরীক্ষা চালানোর মতো বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। অন্যদিকে কেবলমাত্র প্রস্তাবিত বিলসমূহের উপর কাজ করার জন্যই এডহক ভিত্তিতে বাছাই কমিটি নিয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সেগুলির উপর রিপোর্ট প্রদানের জন্যই অস্থায়ী ভিত্তিতে বিশেষ কমিটিগুলি গঠন করা হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলি নির্বাহী সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। এছাড়া অধিবেশন চলাকালে বিভিন্ন সময়ে সংসদ যেসব বিল বা বিষয় তাদের বরাবরে পাঠায়, তারা সেগুলিও পর্যালোচনা করে। প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য প্রতিমাসে এই কমিটিগুলির অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা।

অর্থ ও হিসাব নিরীক্ষা কমিটি সরকারের ব্যয় ব্যবস্থাপনার উপর নজরদারির দায়িত্ব পালনের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। এভাবেই একজন সংসদ-সদস্যের সভাপতিত্বে সরকারি হিসাব কমিটি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার বার্ষিক হিসাবপত্রের উপর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে। অনুরূপভাবে সরকারের এসব সংস্থার আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দেওয়া অনুমোদন অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিচালিত হয়েছে কিনা বা কোথাও কোন অনিয়ম হয়েছে কিনা তাও এ কমিটি নির্দেশ করে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থাও কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। ব্যয় প্রাক্কলন কমিটি সারা বছর ধরে সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সরকার পরিচালনায় আর্থিক ব্যয় সংকোচন ও দক্ষতার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র এবং রিপোর্ট সরকারি অঙ্গীকার সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়। এ পর্যালোচনায় কমিটি সরকারি দপ্তরসমূহের হিসাবপত্র এবং সরকারের প্রচলিত নীতিমালার মধ্যকার ব্যবধানের চিত্রটি তুলে ধরে। অন্যান্য স্থায়ী কমিটি যেসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, তার মধ্যে রয়েছে সংসদ সদস্যদের অধিকার ও রেয়াতের বিষয়, আর্জিতে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ, সরকারি বিল উপস্থাপনে সময় বরাদ্দের বিষয়, বেসরকারি সদস্য বিল, সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে কর্মকাণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার নিয়মকানুন ও রীতিনীতি, পাঠাগার সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সংসদ সদস্যদের জন্য আবাসিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। স্থায়ী কমিটি বৈঠকে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে নিজেদের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রদান এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট কমিটির সামনে প্রয়োজনীয় তথ্য হাজির করে থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনের কর্মকাণ্ডের উপর নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে জনপ্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকেবহাল রাখার সুযোগ পান। হিসাব ও সরকারি ব্যয়ের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে আর্থিক কমিটিগুলি সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করে। একই সঙ্গে অনুমোদিত রীতিনীতি অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে কিনা তাও যাচাই করে।

জাতীয় সংসদ বরাবরই এর কমিটি কাঠামো বিন্যাস করে আসছে। প্রথম সংসদের অধীনে সাতটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সময়ের পরিবর্তন ও রাষ্ট্রীয় কার্যপরিধি বৃদ্ধির কারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সংখ্যা বেড়ে পঞ্চম সংসদের অধীনে ৪৯ এবং সপ্তম সংসদে ৪৬-এ দাঁড়ায়। একই সঙ্গে উপ-কমিটির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তম সংসদ গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলির প্রধান ছিলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিগণ। সপ্তম সংসদের পঞ্চম অধিবেশনেই কার্যপ্রণালী বিধিতে একটি সংশোধনী গৃহীত হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী স্থায়ী কমিটির সবগুলিতেই মন্ত্রীদের পরিবর্তে সংসদ-সদস্যদের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের কাছ থেকে কার্যকরভাবে জবাবদিহিতা আদায়ে কমিটিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। (হাসানুজ্জামান: ১৯৯৮)

বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের কার্যসম্পাদনে একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। আধুনিক কালে পার্লামেন্টের কার্যের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিটি বিল, পার্লামেন্টারী সুপারিশ প্রভৃতি বিষয়ে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করা

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ব্যবস্থার বিস্তৃতি বিষয়ে আলোচনা, বিশেষায়িত জ্ঞান প্রয়োগ এবং স্বল্প সময়ে সর্বোত্তম কাজ করার জন্য পার্লামেন্টের কাছে একমাত্র উপায় হলো শক্তিশালী ও কার্যকর কমিটি ব্যবস্থা। কমিটি ব্যবস্থার দক্ষতা ও গতিশীলতা পার্লমেন্টকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তোলে। কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেছে উন্নত বিশ্বে।"

বাংলাদেশের কার্যপ্রনালী বিধি অনুযায়ী কমিটি অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব কমিটিও এর অন্তর্ভূক্ত।

সপ্তম সংসদের সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

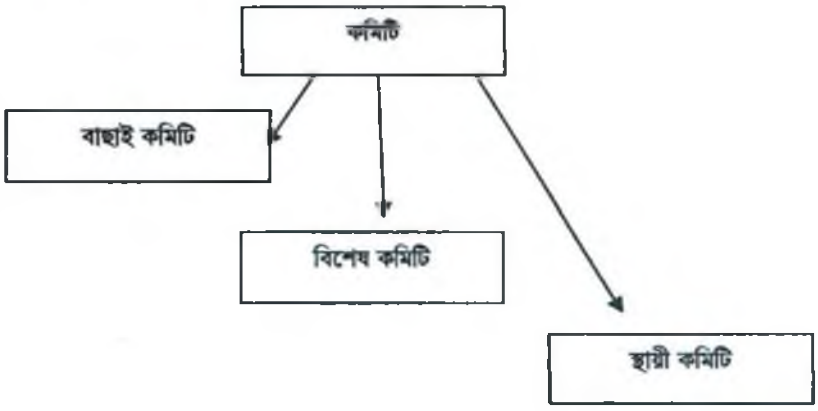

চিত্র -২: কমিটি এর প্রকারভেদ

Source : Nahid: (1999)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে আলী আশরাফ কার্যক্রমের দিক দিয়ে একে তিনটি ভাগ ভাগ করেন।

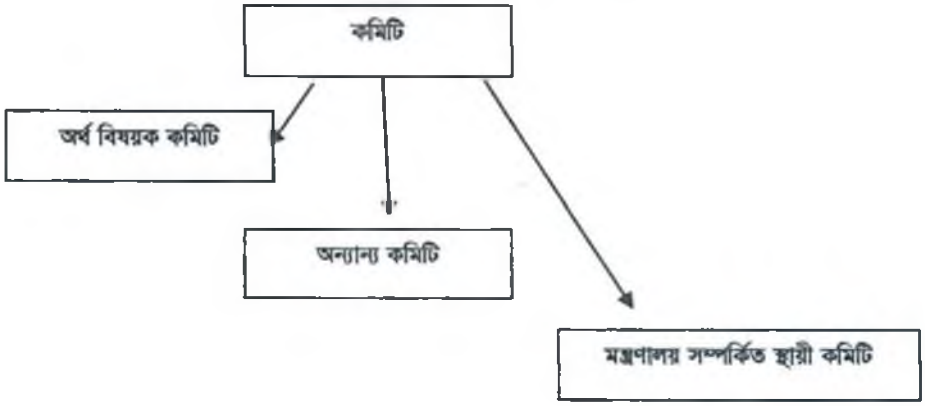

Source: Ali Asraf (1999)

বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগ তার কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। বর্তমানে সংসদের কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব কমিটির কার্যাবলীও বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করে।

সংসদের কার্যক্রম নির্ধারণ করে থাকে কার্যউপদেষ্টা কমিটি। এই কমিটি গঠিত হয় ২০০১ সালের ৪ নভেম্বর। এ কমিটির মোট সদস্য ছিল ১৫ জন যা কার্যপ্রণালী বিধির ২২০(১) বিধি অনুসারে গঠিত হয়।

সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা থাকলেও চলতি সংসদের কমিটিগুলো ছিল কার্যত অকার্যকর। সংসদ নির্বাচনের দেড় বছর পর গঠিত হয়েছিল এসব কমিটি। সব মিলিয়ে ৪৮টি স্থায়ী কমিটি। এরমধ্যে ১১টি সংসদবিষয়ক এবং ৩৭টি

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। অষ্টম সংসদে স্থায়ী কমিটির মোট ১ হাজার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাব কমিটির বৈঠক ৪৬৮টি অনুষ্ঠিত হয় যার মধ্যে ৯৫টি ছিল সংসদের বাইরে। এ সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বেশ কয়েকবার সংসদের অধিবেশন বয়কট করলেও পুরো মেয়াদকালে সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয়ের কাছে নানা বিষয়ে সুপারিশ পেশ করলেও তার অধিকাংশ উপেক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫ ঃ

সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতা ও বিরোধী দলের ভূমিকা: ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব এক অনবদ্য ভূমিকা পালনে ব্রত হয়। কারন, সারকারি দলের একমূখী নীতিসমূহ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে সেটা জনকল্যাণমূখী করার প্রয়াস চালায় বিরোধী দল। সরকারি দলের আলোচনা ও সমালোচনা করে তাদের গণতান্ত্রিক ভাবধারায় ধাবিত করা সম্ভব। উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলাদেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সংসদীয় সরকার এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। Earnest Barker Said" A cabinet is strengthened rather than weakened by the existence of an organized opposition and thus the requirement for ready provision of leadership is mostly satisfied when there is a coherent group of alternative leaders well prepared to supply an alternative guidance. Balanced and effective opposition is indeed a powerful instrument to achieve the goals of an instrument to achieve the goals of an effective government. (Barker, Earnest: 1958)

✦ Role of opposition party:

Inside the Legislature out side the leg stance

সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকাকে দু' ধরনের প্রেক্ষিতে দেখা হয়ে থাকে এর "Proactive" [৭৫] বা উদ্যোক্তা এবং "Reactive" [৭৬] বা প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকা। বিরোধীদলীয় সদস্যগণ তখনই Proactive বা উদ্যোগমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় যখন তাদের জন্য আইন প্রণয়নমূলক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে সরকার কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত যেকোন নীতিমালার প্রতি বিরোধী দলের কেবলমাত্র সাড়া প্রদানমূলক আচরণকে এক Reactive ভূমিকা বলা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিগত সংসদসমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সময়েই বিরোধীদলীয় সদস্যগণ Reactive ভূমিকা পালন করছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাগণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি করেন। এ আদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মূলতঃ শাসন ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ তার জন্মলগ্ন হতে সে নীতি বা আদর্শ লালন করে আসছিল তার সফল বাস্তবায়ন হয়।

আওয়ামীলীগ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল অতিদ্রুত বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করন। এবং এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণকে একটি সংবিধান উপহার দেয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধানটি গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের জন্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধাচের সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থাকে "Westminster Model" হিসেবে চিহ্নিত করলেও আসলে তা ছিল ভারতীয় মডেলের সংসদীয় ব্যবস্থা ২২ যার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য বা আধিপত্য।

স্বাধীনতা লাভের পরে আওয়ামী সরকার দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তা ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রয়ণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রুপ লাভ করে এবং বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়। Moudud Ahmed লিখেছেন, " The constitution of Bangladesh envisaged a west minister type of parliamentary system, reflecting the aspirations of the people nurtured for nearly two

Dhaka University Institutional Repository

decades. The Awami leagues commitment since its inception for the estalilishment of a real living democracy for which they struggled and suffered for so many years could now be fulfilled beacuse of the alsolute power of the Government". (Ahmed Moudud:1983).

স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে দেশের Constitution রচনা সমাপ্ত করা এবং নতুন Constitution প্রবর্তনের তিন মাসের মধ্যে দেশব্যাপী সাধারন নির্বাচন দেওয়া গণতান্ত্রিক দুনিয়ার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একই দৃষ্টান্ত স্থাপনের সকল কৃতিত্ব আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের । স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যুদ্ধেরই এটা গণতান্ত্রিক রূপ।

আওয়মী লীগ সহ মোট ১৪ টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এ নির্বাচনে প্রতিদ্বান্দ্বিতা করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচির উপর গণভোট বলে আখ্যায়িত করে। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনকে বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মূলনীতির- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার উপর গণভোট বলে অভিহিত করে। অপরপক্ষে প্রধান বিরোধী দল সমূহ (ন্যাপ-ভাসানী, জাসদ) ঘোষণা করে যে, সংবিধানটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা নির্বাচিত হলে একটি নতুন গণতান্ত্রিক ও নির্ভেজাল সমাজতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দেবে।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের সাধারন নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১,৮৮,৫১,৮০৮ এবং এটা ছিল মোট ভোটার সংখ্যার ৫৫.৬২% । ১২০ জন নির্দলীয় প্রার্থীসহ মোট ১০৭৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৭৩.২০% এবং ২৮৯টি আসনে মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে । অবশিষ্ট ৭টি আসনের মধ্যে জাসদ ১টি । জাতীয় লীগ ১টি এবং নির্দলীয় প্রার্থীগন ৫টি আসন লাভ করে। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী প্রার্থীগন ৭ মার্চ ভোট গ্রহনের পূর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এবং মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের ১৫টি আওয়ামী লীগ লাভ করে। এ ভাবে ১৯৭৩ সালে নির্বাচন মোট ৩১৫টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

৩০৮টি আসন পায়। ১৯৭৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ৫টি উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুটি আসন হারায়। ফলে প্রথম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাড়ায় ৩০৬টি।

টেবিল-৬: ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দল	মনোনীত প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	২৮৯	২৮২	৭৩.২০
ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ (মোজাফফর)	২২৪	-	৮.৩০
বাংলাদেশর কমিউনিষ্ট পার্টি	৪	-	০.২৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	১	৬.৫২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৬৯	-	৫.৩২
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	-	০.২০
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি {নেলিনাবাদী}	২		০.১০
বাংলার কমিউনিষ্ট পাটি	৩	-	০.০৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	-	০.০৯
বাংলার ছাত্র উন্নয়ন	১	-	০.০৪
জাতীয় লীগ	৮	১	.৩৩
বাংলার জাতীয় লীগ	১১	-	০.২৮
জাতীয় গণতান্ত্রিক দল	১	-	০.০১
জাতীয় কংগেস	৩	-	০.২
নির্দলীয় প্রার্থী	১২০	৫	৫.২৫
মোট	১০৭৮	২৮৯	১০০

Source:- Bangladesh Election commission

এ নির্বাচনটা ছিল বাংলাদেশের পালামেন্টারী গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রথম দিক। আওয়ামী লীগই দেশকে এই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান দিয়াছে। পার্লামেন্টারি পদ্ধতিই বাংলাদেশের জন্য এক মাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন মানে বিরোধী দলের যথেষ্ট সংখ্যক ভাল মানুষ নির্বাচিত হোক সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কাজেই নির্বাচনে সরকারী দল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের প্রতি উদার হওয়া উচিত ছিল। উদার হতে তারা রাজী ও ছিলেন। রেডিও, টেলিভিশন বিরোধী দল সমূহের নেতাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে তাদের আপত্তি ছিলনা। কিন্তু পরপর কতকগুলি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আওয়ামী নেতারা কঠিন হয়ে পড়েন। সরকারী দল হিসেবে দেশের সমস্ত দুর্দশা দূর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। এই মনেভাব হতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হারাবার যথেষ্ট কারন ছিল। তার উপর বছরের শুরুতেই

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারিতে, ভিয়েতনাম উপলক্ষে ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চালানোর দরুণ দুইজন ছাত্র নিহত ও অনেক আহত হয়। পরদিন দেশব্যাপী হরতাল হয়। ফলে আওয়ামী ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারান। মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নই সরকার বিরোধী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ আন্দোলনের কারনেই ছাত্র লীগের লোকেরা ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের অফিস পুঁড়িয়ে দেয় তাতেও আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হয়। এই অজনপ্রিয়তা প্রসারিত হয় সরকারের বর্ডার প্যাক্ট ও পাটনীতি উপলক্ষ করে।

অপরদিকে বিররাধী দলসমূহের মধ্যে একটা যুক্তফন্ট গড়ে উঠার চেষ্টা থাকলে পরে তা আর হয়নি। বিরোধী দল সমূহের আস্থা ও জয়ের আশা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে একুশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যখন মুক্তি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য সোহরাওয়াদী উদ্যানে এক জনসভা করছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বদলীয় বিরোধী নেতা মওলানা ভাসানী সাহেব পল্টনে এক বিশলাল জনসভার বক্তৃতা করছিলেন। এ অবস্থায় আওয়ামীলগ লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা বোধ হয় সম্ভব ছিল না । রেডিও টেলিভিশনে অপজিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যানবাহনের অভাবে তাঁরা ঠিকমত প্রচার চালাতে পারেননি। অন্যদিকে শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূনিঝড় ট্যুর করেন। মন্ত্রীরাও সরকারী যানবাহনের সুবিধা নেন। যার ফেলে নির্বাচনে অপজিশনের ভরাডুবি হয় এবং অপজিশন হন মাত্র ৭ জন। Z. R Khan বলেন,"The overwhelming victory of Mujib and his party of the 1973 general elections greatly reduced the chances of a blanced growth of parliamentary demoracy." (Khan : 1984).

Moudud Ahmed বলেন,"This election created a credibility gap for Awami Leagus, widened the chasm between the parties of the opposition and the ruling party and caused a genuine suspicion in the minds of the people about the bonafide of the whole election system." (Ahmed, Moudud- 1983]

Dhaka University Institutional Repository

Rounaq Jahan বলেন, "The AL strategy of 'overkilling' the opposition turned out to be counterproductive from the stand point of giving the nascent democratic system an institutional base." (Jahan Rounaq:1980]

জাসদ নেতৃবৃন্দ বলেন,"এই নির্বাচনের ফলাফল মেহনতী জনগনের বিপ্লবী অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করার পাশাপাশি এটাকে একটি প্রতারণা বলে উল্লেখ করেন।"

জাতীয় লীগের একমাত্র বিজয়ী প্রার্থী ও দলীয় প্রধান বলেন,"এই নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপেক্ষা অসৎ নির্বাচন এবং তাঁর নির্বাচনী অভিজ্ঞতাকে দুঃস্বপ্ন বলে বর্ণনা করলেও নির্বাচন বাতিল করার জন্য গণআন্দোলনের সম্ভাব্যতা বাতিল করে দেন।"১৯৭৩ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য ছিল এরকম, "দেশে কোন বিরোধী দল নেই।" বিরোধী দলগুলো প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করে এবং অভিযোগ উপস্থাপন করে যে, "আওয়ামীলীগ দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।"

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে অন্যান্য বিরোধী দলগুলো নানা অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। Nizam Ahmed বলেন, "The opposition alleged massive rigging by the al in the elections. The election results were reversed in many constituencies where the opposition candidates were leading."..(Ahmed, Nizam- 2002). Rounaq Jahan বলেন, "The AL'S policy of putting maximum pressure to win every parliamentary seat wiped out the opposition from the JS and diminished its stake in the maintenance of the [legislative] system." (Jahan, Rounaq- 1980]

Dhaka University Institutional Repository

"আওয়ামীলীগের প্রার্থীগণ তাদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিরাট ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল যা দুটি কেন্দ্রের প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনোত্তর ফলাফল জরিপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কাজেই, বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না।"

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে ন' জন বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য মিলে এক বিরোধী দল গঠন করে কিন্তু সরকার তা গ্রহন করতে অস্বীকার করে । প্রধান মন্ত্রী যুক্তি দেন যে, বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে অন্তত ২৫ জন্য সদস্য হতে হবে। এমন কি বিরোধী গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতির জন্য কম পক্ষে ১০ জন সদস্যের প্রয়োজন। (১৯৭৩-৭৫) আমলে জাতীয় সংসদে ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘন্টা বৈঠক হয় এবং এতে ১০০টি বিল পাস হয়। প্রথম জাতীয সংসদে সংসদীয় আমলে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারন বিলের অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা নিম্নের টেবিলে দেখুন।

অধিবেশন	বিলের নোটিশ সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিল		সংসদে উত্থাপিত বিল		সংসদে পাসকৃত বিল	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রথম অধিবেশন ৭.৪.৭৩-১৯.৪.৭৩	-	-	-	-	-	-	-
দ্বিতীয় অধিবেশন ২.৬.৭৩-১৭.৭.৭৩	১৫	১৫	১০০	১৫	১০০	১৪	৯৩.৩৩
তৃতীয় অধিবেশন ১৫.৯.৭৩-২৬.৯.৭৩	১৫	১৫	১০০	১৪	৯৩.৩৩	১৪	৯৩.৩৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধিবেশন ১৫.০১.৭৪-৫.২.৭৪	৩২	৩২	১০০	৩২	১০০	৩১	৯৬.৮৮
পঞ্চম অধিবেশন ৩.৬.৭৪-২২.৭.৭৪	২৮	২৮	১০০	২৮	১০০	২৮	১০০
ষষ্ঠ অধিবেশন ১৯.১১.৭৪-২৩.১১.৭৪	১৩	১৩	১০০	১২	৯২.৩১	১২	৯২.৩১
সপ্তম অধিবেশন ২০.১.৭৫-২৮.১.৭৫	১০	১০	১০০	৬	৬০	১	১০
মোট	১১৩	১১৩	১০০	১১৩	১০০	১১৩	১০০

টেবিল- ৭: ১ম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা

১০০ টি গৃহীত বিলের মধ্যে পর্যাপ্ত আলোচিত ১৪টি বিলের তিনটি সম্পর্কে বিরোধী দলীয় সদস্যরা প্রবল আপত্তি করেন এবং এ গুলোর মধ্যে উত্তপ্ত আলোচনা হয় এবং এই বিল গুলি সম্পর্কে বিরোধী দলীয় সদস্যদের কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া তারা বিল পাশের সময় ওয়াক আউট করেন। ফলে বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে তিনটি বিল পাস হয়।

সংসদীয় আমলে প্রথম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ণমূলক কাজের খতিয়ান নিম্নের টেবিলে দেখুন

•	বিলের নোটিশ সংখ্যা	১১৩
•	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

•	সংসদে গৃহীত মোট বিলের সংখ্যা	১০০
	ক) মৌলিক বিল	৪৫ (৪৫%)
	খ) অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	৫৫%
	গ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৫৬%
	ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৪৪%
	ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	২৯%
	চ) সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	৭১%

টেবিল -৮: ১ম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান।

১৯৭৩ সালে ১৪ জুন প্রথম বাজেটটি সংসদে উত্থাপিত । এতে ৬৪ জন সংসদ সংসদ্য অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৫৭ জন সরকার দলীয় এবং ৭ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন।

সাধারন বাজেট (১৯৭৪-৭৫) ১৯৭৪ সালে ১৯ জুন এটি উত্থাপিত হয়। এর সাথে ১৯৭৩-৭৪ সালের সম্পূরক বাজেট ও পেশ করা হয় এতে ৬২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৫৫ জন সরকার দলীয় এবং ৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন । সংসদীয় আমলে প্রথম পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান নিম্নের টেবিলে দেখুন

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটির্শের সংখ্যা	স্পীকার কতৃকগ্রহীত	সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত	সংসদে গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	
তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন	৭৫৭৬	৫৪১৩	৭১.৪৫	৪৬৭৪	৬১.৬৯	-
সম্পূরক প্রশ্ন	৪৩২৫	৪৩২৫	১০০	৩৩৫৩	-	-
তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন	৩০	২৬	৮৬.৬৭	৪	১৩.৩৩	
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১০৮	৫০	৪৬.৩০	২৫	২৩.১৫	
মুলতবী প্রস্তাব	১৬	১	৬.২৫	.০০	০.০০	.০০
মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব	২২৬	৫১	১২.২৭	২৮	১২.২৩	
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	১৯	৫	২৬.৩২	৪	২১.০৫	-
বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	৩৪৩	২৭২	৭৯.৩০	৬	১.৭৫	০.০০
অনাস্থা প্রস্তাব	১	-	০.০০	.০০	.০০	.০০

টেবিল -৯: ১ম পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

সংসদে বিরোধী দলসমূহের স্বল্প প্রতিনিধিত্ব এবং সরকার কর্তৃক তাদের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দানের অস্বীকৃতির ফলে সংসদের প্রতি বিরোধী দলের আগ্রহ কমে যায় ।

১ম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধিতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, অনীহা প্রস্তাব, মূলতবি প্রস্তাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষণীয় প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের মতো সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় পদ্ধতির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতিগুলো ততটা কার্যকরী ছিলনা। যে পদ্ধতিতে ১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল এবং ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস করা হয়েছিল তাতে এ সংসদ তার কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা দূরে থাকুক তার কার্যাদি সম্পাদনে কোনরূপ স্বায়ওশাসনের অধিকারী নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে বিরোধী দলের সংখ্যা ৭ হওয়া তাদেরকে তেমন গুরুত্বই দেওয়া হত না জাসদ নেতা মইন উদ্দিন আহমদ বলেন, আমাদের ৭ জন সদস্যের বক্তব্যকে শেখ মুজিবের পার্লামেন্টের সদস্য বা তীব্র ভাবে বিরোধিতা করত। আমরা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করলে আওয়ামী লীগের শতাধিক এমপি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করত এবং জঘণ্য ভাষায় গালাগাল করত।"

যে সময়ে সংসদীয় সরকারের দায়িত্বশীলতা বিনষ্ট হওয়ার একটি বড় কারণ ছিল গোটা সময় ধরে সংবাদ পত্রে ও মত প্রকাশের ও পর নানাবিধ সেন্সরশীপ ও দমননীতি প্রয়োগ হয়েছিল। প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স ১৯৭৩, স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট রুলস ১৯৭৫, ম্যানেজমেন্ট বোর্ড এসবের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। তখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এর বিকল্প কোন দল জাতীয় ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। ফলে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া ভাবে গণতন্ত্রের নামে একক প্রধান্য বিস্তার করে গেছে। Rounaq Jahan বলেছেন, " In a relatively short span of three years following the birth of the country the ruling elite of Bangladesh first adopted and later rejected parliamentary democracy as its model of government and politics. The constitutionals experimentations in Bangladesh in the aftermath of liberation are very similar to the constitutional changes in other new states of the third world. What is was the ruling elites did not have sufficient empathy. For liberal constitutional democracies, and they grossly violated the rules of the game. (Jahan Rounaq: 1980)

যে সমস্ত কারনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় তা নিচে দেওয়া হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১) তৎকালীন সংসদের ৩১৫টি আসনের মধ্যে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯টি । বিরোধী দলসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, মোজাফফর আহম্মদ, ডাঃ আলিমুর রাযী জনাব নরুর রহমান, হাজী মোহাম্মদ দানিশ প্রভৃতি জন পঁচিশের মত অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানকে জয়ী হতে দেওয়া আওয়ামী লীগের ভালোর জন্য উচিত ছিল। এসব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারির অপজিশন থাকলে পার্লামেন্টের সজীবতা বৃদ্ধি পেতো। তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সরকারী দলের মেম্বররা ভাল ভাল দক্ষ পার্লামেন্টারীয়ান হয়ে উঠতেন। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যার্থতার গতি আরো ত্বরন্বিত হয় ।

২) ক্ষমতাসীন দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারনে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। Arend Lij Phart বলেন, "A Great many of the developing countries, particularly those in Asia and Africa, but also some south American countries are beset by political problems crising from the deep divisions between segment of their populations and the absence of a unifying consensus. (Phart A. Lij: 1977)

৩) সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকা একান্ত প্রযোজন । গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর দলগুলোর শ্রদ্ধাবোধ না থাকায় বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়।

৪) এ সময় বিশ্ববাজারেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। এছাড়াও ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে দূর্ভিক্ষের কারনে দেশের অর্থনীতি অনেকটা খারাপ হয়ে যায়। মূলত এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সরকার প্রশাসনিক পরিবর্তন করে এক কঠোর নিয়ন্ত্রামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হন।

৫) তাছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যার্থতার অন্যতম প্রধান কারন ছিল দক্ষ ও অনুগত আমলার অভাব ।

Dhaka University Institutional Repository

Moudud Ahmed বলেছেন, "Mujib is the greatest phenomenan of our history. His death was not his end. He will continue to remain as a legend in the political life of Bangladesh. Bengalis might have had leaders in their history More intelligent, more capable and more dynamic than sheikh Mujib but none give so much to the Bengalis Political independence and national Identity. It is Mujib who in the end was able to identity himself not only with the cause of the Bengalis but with their dreams. He became the symbols of Bengali nationalism, which birth to a movement leading to an independent and sovereign identity in whatever form Bangladesh exists or whatever reversal it tales in its domestic political content on in its foreign relations. Mujib's position as a leader of the nationalist movement will not alter.(Ahmed Moudud:1983)

সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য যেরূপ দায়িত্বশীল বিরোধীদলের প্রয়োজন বাংলাদেশে তার অভাব ছিল। এছাড়া শেখ মুজিব যখন উপলবদ্ধি করেন যে, তিনি জনগনের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হচ্ছেন এবং বামপন্থী বিপ্লবীরা তাঁর সরকারের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে তখন তিনি "শোষিতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে নিজ হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে নেন এবং এক দলীয় রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । এভাবে বহু কাঙ্খিত সংসদীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬ঃ

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পরে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা এবং শেখ মুজিবর রহমানের মন্ত্রি পরিষদের ডানপন্থী সদস্য খন্দকার মুস্তাক আহমদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রূপে অধিষ্ঠিত হন এবং তা ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বিচারপতি সায়েমের শাসনকাল বিস্তৃত ছিল ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশে এক সামরিক অভ্যুত্থানঘটে। এর নেতৃত্ব দান করেন বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশারফ। খন্দকার মুস্তাক আহমদ পদত্যাগ করলে ব্যাংলাদেশের প্রধান বিচার পতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দান করেন খালেদ মোশারফ। জিয়ার শাসনামলকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন। ১৯৭৯ সালে ৬ এপ্রিল থেকে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত জিয়া বে-সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন কার্য পরিচালনা করেন । ১৯৭৮ সালের ৩ জুনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তাঁর প্রশাসনকে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৮ সালের ২৮ এপ্রিল তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত রাষ্ট্রাপতি নির্বাচন পদ্ধতি অধ্যাদেশ জারি করেন এবং ১৯৭৮ সালের ৩ জুন দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

টেবিল-১০: ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল

দল/ফ্রন্টের নাম	প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট
জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট	জেনারেল জিয়াউর রহমান	৭৬.৬৭
গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	জেনারেল এম. এ জি ওসমানী	২১.৭০
অন্যান্য		১.৬৩
মোট		১০০

Source: Abdul Latif Masoom (1988)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮ সালের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জিয়া ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষনা করেন। এ ছিল ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিপরে গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্ব প্রথম প্রচেষ্টা। নির্বাচন হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে। নির্বাচনে ছোট বড় ৩১টি দল অংশগ্রহন করে। ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন ও শতকরা ৪৪ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন ৩২৫ ভাগ ভোট লাভ করে এবং সংসদে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে অবির্ভূত হয়।

টেবিল-১১: ১৯৭৯ সালের ২য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট শতকরা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	২৯৮	২০৭	৪১.১৬
আওয়ামী লীগ	২৯৫	৩৯	২৪.৫৫
মুসলীম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ	২৬৬	২০	১০.০৮
জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল	২৪০	৮	৪.৮৪
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২	২.৭৮
ন্যাপ)মোজাফর)	৮৯	১	২.২৫
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	১১	-	০.০৩৯
অন্যান্য দল	৩২০	৭	৩.৮৫
স্বতন্ত্র	৪২২	১৬	১০.১০
মোট	২১২৫	৩০০	১০০

উৎস: আবুল ফজল হক (১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে পর্যন্ত জিয়া বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জিয়া ১৯৭৯ সালের ২৭ জানুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

M. M. Khan and H. Jafarullah বলেন, "The spectacular victory of the ruling party was, however, attributed more to the charisma of Zia than to its organizational ability. Zia campaigned vigorously for all his incumbent ministers and the candidates he wanted in the parliament." (Jahan: 1980)

Ziring এর পর্যবেক্ষণ হলো যে, "The second JS elections helped Zia to isolate the all and simultaneously neutralize the JSD that was at serious odds with the Zia regime." (Ziring: 1993). Moudud Ahmed বলেন, "Zia adopted a policy of allowing as many opposition leaders to win as possible not by doing them any special favours but by not giving any extra-help or patronage to his own party candidates" (Ahmed, Moudud: 1983). Nizam Ahmed বলেন, "A competitive parliament did not pose any challenge to Zia's authority and Power' rather he needed a strong parliamentary opposition to have a more informed scruting of his policies and programmes." (Ahmed, Nizam: 2002). Nazam Ahmed আরো লিখেছেন, "The opposition parties alleged serious rigging of the polls by the ruling party but they were unable to organize any strong mass movement against the government." (Ahmed, Nizam: 2002) আব্দুল মালেক উকিল বলেন, "একটি নীল নকশার মাধ্যমে সরকার নির্বাচনে কাউকে হারিয়েছেন, কাউকে জিতিয়েছেন।" সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, "নির্বাচনের পূর্বে সরকার যে নীল নক্শা তৈরী করেছিল, তাই বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবাদসহ নির্বাচনের রায় মেনে নিয়েছি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের সঙ্গে ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের কোন তফাৎ নেই। সরকার ব্যাপক কারচুপি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির আশ্রয়ে একটি রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট গঠনের মাধ্যমে দেশে একনায়কতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।" ডঃ আলীম আল রাজী বলেন, "নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, কিংবা কারচুপি হয়েছে বলে যেসব বিরোধী দল এখনো অভিযোগ করেছেন".....তাদের প্রতি সমবেদনা জানান, তিনি বিরোধী দলগুলোর উদ্দেশ্যে বলেন, "আগুনে হাত দিয়ে পুড়বে, এটা জেনেও কোনো ব্যক্তি আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়ালে তার জন্য সমবেদনা জানান ছাড়া আর কি করতে পারি।" জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা বলেন, "সাম্প্রতিক নির্বাচনে দুর্নীতি ও কারচুপি অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।" জিয়ার শাসন আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে তা গৃহীত ও পাশ হয়। পঞ্চম সংশোধনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ দ্বারা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহ নির্মমভাবে নিহত হন।

১৯৮১ সালের ৩০ শে মে চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে রাষ্ট্রাপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে সংবিধান অনুযায়ী উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী পাশ হয় এবং বিচারপতি সাত্তার প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিচারপতি সাত্তার বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১২: ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী	বিচারপতি আবদুস সাত্তার	৬৫.৮০
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	ডঃ কামাল হোসেন	২৬.০৫
অন্যান্য ও স্বতন্ত্র		৮.১৫
মোট		১০০

উৎসঃ ইসলাম (১৯৯৭)

১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ বিচারপতি সাত্তার সেনা বাহিনীর অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং ১৯৮৩ সালের ১১ ডিঃ আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। তিন দফা তারিখ পরিবর্তনের পর (২৭মে ১৯৮৪, ৬ এপ্রিল ১৯৮৫, ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬) অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট জাতীয় পার্টি, জামায়াত, জাসদ, মুসলিম লীগ, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহন করে । বি.এন,পি র নেতৃআধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে।

টেবিল-১৩: ১৯৮৬ সালের ৩য় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট (%)
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৫
এন. এ. পি	১০	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়ার্কার্স পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ)মোজাফফর)	১০	২	০.৭১
গণআজাদী লীগ	১	-	০.০৮৮
জামায়ত-ই-ইসলামী	৭৬	১০	৪.৬০
জাসদ (রব)	১৩৮	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১০৩	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৭.৮৬
মোট	১৬২৭	৩০০	১০০

উৎস: হক (১৯৯৫)

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট সর্বমোট ৯৭টি আসন এবং শতকরা ৩১.২১ ভাগ ভোট পায়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, নির্বাচনে জনগন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগ ও জোটে প্রার্থীদেরই জয়ী করেছিল, কিন্তু এরশাদ সরকার মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে সে বিজয় ছিনিয়ে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। প্রধান বিরোধী দলসমূহ নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে ছোট ছোট দল ও স্বতন্ত্র মিলে মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরশাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং সরকারি হিসেব অনুযায়ী বিপুল ভোটের ব্যবধানে নিবাচিত হন।

১৯৮৭, সালের জুলাই-আগষ্টে বিরোধী দলীয় জোটগুলো এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর এ আন্দোলন অত্যন্ত সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ২৯ নভেম্বর দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষনা করেন এবং পরের বছর ৩ মার্চ নতুন সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বি. এন. পি সহ প্রধান বিরোধী দল সমূহ এ নির্বাচন বয়কট করে। ফলে তা এক প্রহসনে পরিনত হয়।

টেবিল-১৪: ১৯৮৮ সালের ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রাপ্ত আসন
জাতীয় পার্টি	২৫১
সম্মিলিত বিরোধী দল	১৯
ফ্রিডম পার্টি	২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৩
স্বতন্ত্র	২৫
	সবমোট ৩০০

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবরে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে তা গন-অভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে । বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭, ও ৫ দলীয় জোট নিরপেক্ষ নির্দলীয় তথ্যাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানায় । তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আপামর জনগণের সমর্থন ও প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটসমূহের প্রস্তাবিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য ঘোষিত রূপরেখা গ্রহন করার ঘোষনা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশিত পথে জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষতত্ত্ববধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন । ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহন করেন। ফলে বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সাহাবুদ্দীন আহমেদ এর তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই ছিল সম্পূর্ণ অবাধও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন। এবং এটা ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ যাত্রা ঘটে ।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল অত্যন্ত দূর্বল প্রকৃতির ছিল এবং অনেক সময় সংসদীয় নির্বাচনে বিরোধী দল অংশগ্রহণই করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭ ঃ

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

নব্বই এর দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক মাইল ফলক বিশেষ। কেননা ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার নামে যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃত্ববাদের সূত্রপাত ঘটে তার পরিসমাপ্তি ঘটে ৯০ এর ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পুণরায় গণতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

৭.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল

একটি অবাধ ও নিরপক্ষে নির্বাচনই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি, নিরপেক্ষ নির্বাচনই গণতন্ত্রায়নের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ তার গণতন্ত্রায়নের পথে দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনশত আসনের জন্য প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৭৮৭ জন। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বোচ্চ প্রার্থী সংখ্যা। মোট ৯০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত পচাত্তরটি দল প্রার্থী দাড় করায়। তবে অধিকাংশ দলই ছিল নাম সর্বস্ব সংগঠন।

ছোট ছোট দলগুলি প্রথমে তিন জোটের ঐক্য মতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়নের প্রস্তাব করে। কিন্তু বড় দলগুলি এতে সাড়া দেয়নি। ৫ দলীয় জোট সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন করতে সমর্থ হলেও জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো নিজস্ব প্রতীক নিয়ে পৃথকভাবে নির্বাচন করে। আওয়ামীলীগ ২৬৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এতে পাঁচটি শরীক দলকে ৩৬টি আসনে ছেড়ে দেয়।

নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামীলীগ পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, মুজিব হত্যার বিচার শেখ মুজিবের নীতি

Dhaka University Institutional Repository

সমূহের বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতর নীতি প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সর্বোপরি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি.এন.পি-এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন" অর্থাৎ ধর্মীয় ভাবধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে তাদের লক্ষ্য স্থির করে। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমকে তাদের প্রধান নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে গ্রহণ করে।

নির্বাচন কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। বি.এন.পি ৩০.৮১% ভোট ও ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। আওয়ামীলীগ ৮ দলীয় জোটের শরীক দলগুলোকে যে ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয় সেগুলির ভোট যোগ করলে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের হার দাড়ায় ৩৪%। কিন্তু ৮ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলি মোট আসন পায় ১০০টি। আওয়ামীলীগ ছাড়া ৮ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে বাকশাল ৫টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি ও গণতন্ত্রী পার্টি ১টি আসন লাভ করে। জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন সহ মোট ১২% ভোট পায়। জামায়েত ইসলামী পায় ১৮টি আসন, পাঁচদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে একমাত্র ওয়ার্কাস পার্টি একটি আসন লাভ করে। অন্যান্য যে সব দল সংসদে আসন লাভে সমর্থ হয় সেগুলি হল জাসদ ১টি, ন্যাশনাল পার্টি ১টি ও ইসলামিক ঐক্যজোট ১টি। ৪২৪ জন নির্দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন জয়ী হন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-১৫: পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বি.এন.পি	৩০০	১৪০	৩০.৮১
আওয়ামীলীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাকশাল	৬৮	৫	১.৮১
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	৫	১.১৯
ন্যাপ	৩১	১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	০.৪৫
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
জামায়াতে ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	১	০.৭৯
জাসদ	৩১	১	০.২৫
ওয়ার্কাস পার্টি	৩৫	১	০.১৯
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	১	০.৩৬

উৎস: হক (১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

বি.এন.পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হলেও সরকার গঠনের জন্য যে ১৫টি আসনের প্রয়োজন সে লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়নি। ফলশ্রুতিতে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। অত:পর জামায়াত ইসলামীর সমর্থনে বি.এন.পি সরকার গঠনে সমর্থ হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯ মার্চ তারিখে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি ৩০ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। সরকার গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং নতুন শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা কি প্রকৃতির হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক জটিলতা দেখা দেয়। নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রধান তিন জোটের অঙ্গীকার ছিল দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করণ। নির্বাচনের পর ৮ দল ও ৫ দলের প্রতিনিধিবর্গ এ বিষয়ে পূর্বের অংঙ্গীকার অনুসারে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও বি.এন.পি এ বিষয়ে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারায় রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত ঘটে। মূলত: সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে বি.এন.পি এর মধ্যেই মতভেদ ছিল। দলের নিম্নতর পর্যায়ে নেতাদের একটি বড় অংশ সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন দিলেও খালেদা জিয়া সহ উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দগণ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষপাতি ছিলেন।

ক্রমবর্ধমান বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের দাবী এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আহবান বি.এন.পি কে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মত পরিবর্তনে সহায়তা করে। বি.এন.পি দলীয় সভায় সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তনে পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৯১ সালের ২ জুলাই তারিখে সরকারের পক্ষ হতে সংবিধান সংশোধনী একাদশ ও সংবিধান সংশোধনী দ্বাদশ বিল নামে দুটি বিল সংসদে উথাপিত হয়। এর দু'দিন পর ৪ জুলাই আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ১৪ এপ্রিল তারিখে নোটিশকৃত তার সংশোধনী বিলটি উথাপন করেন। সরকার ও বিরোধী দলীয় উভয় বিলের উদ্দেশ্য ছিল বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের পার্টির রাশেদ খান মেনন ও মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ ও সংবিধানের অধিকতর গণতন্ত্রায়নের উদ্দেশ্যে ৪ জুলাই তারিখে ৪টি সংবিধান সংশোধনী বিল উথাপন করেন। উপরোক্ত বিলগুলি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১ জুলাই তারিখে একটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটি ব্যাপক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌছাতে সমর্থ হয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

তদনুসারে ৭টি বিলের সমন্বয়ে আইন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল নামে দুটি বিল ২৮ জুলাই তারিখে সংসদে পেশ করেন। ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা ঘটে।

৭.২ পঞ্চম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল

১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদ তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালের প্রথম জাতীয় সংসদের পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পঞ্চম সংসদের শুভ সূচনা ঘটে। ৯১ এর ৫ এপ্রিল হতে ৯৫ এর ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০১ কার্যদিবসে ১৮৩৮.১২ ঘন্টা পঞ্চম সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে সরকারী কার্যদিবস ছিল ৩৩৩ দিন এবং বেসরকারী কার্যদিবস ছিল ৬৮ দিন। কার্য প্রণালী বিধির ২১৬ নং ধারার আওতায় মোট ৫ বার বিভক্তি ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী কালে ৪ বার এবং মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণকালে একবার বিভক্তি ভোট হয়। ৫ম সংসদে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ দ্বারা পৃথকভাবে মোট ৬২ বার ওয়াকআউট এর ঘটনা ঘটে। পঞ্চম সংসদে মোট ১৬ জন সদস্যের ক্ষেত্রে দল বদল এর ঘটনা ঘটে। তিনজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দল ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাদের আসন শূণ্য ঘোষিত হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকাকে দু ধরনের প্রেক্ষিতে দেখা হয়ে থাকে এর Proactive বা উদ্যোগমূলক ভূমিকা এবং Reactive বা প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকা। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ তখনই Proactive বা উদ্যোগমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় যখন তাদের জন্য আইন প্রণয়নমূলক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে সরকার কর্তৃক বা প্রণীত যে কোন নীতিমালার প্রতি বিরোধীদলের কেবলমাত্র সাড়া প্রদানমূলক আচরণকে এর প্রোএকটিভ ভূমিকা বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ নব্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে বিরোধীদলের এরূপ প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বিগত সংসদ সমূহে বিরোধীদলের এরূপ প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বিগত

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সময়েই বিরোধী দলীয় সদস্যগণ রিএকটিভ ভূমিকা পালন করেছেন। তবে ৫ম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখে থাকি। এ সংসদে বিরোধী দলের ব্যাপক উদ্যোগমূলক ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। বিরোধীদলের এরূপ ভূমিকার পশ্চাতে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিনিধিত্বের মাত্রা বা সংখ্যাগত অবস্থান। বিগত সংসদ সমূহের তুলনায় পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান ছিল অনেক সুদৃঢ়।

পরিসংখ্যান হতে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম সংসদের শতকরা সরকারী ও বিরোধীদলের অবস্থানগত ব্যবধান ২.৭%। ফলশ্রুতিতে এ সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধীদলের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। এ সংসদের প্রথম অধিবেশনে সরকার পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরোধীদল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুণঃপ্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতি সংবলিত একটি বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য নোটিশ দেন। অন্য কয়েকটি বিরোধী দলের সদস্যও সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করে। পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের আরো কতিপয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকার মধ্যে একটি হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব এবং অপরটি হচ্ছে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারকে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনে বাধ্যকরণ। এছাড়াও, সংসদীয় গণতন্ত্রের বেসরকারী সদস্যদেরকে সরকারকে জবাবদিহিমূলক ও দায়িত্বশীল করবার জন্য যে সকল উপায় রয়েছে তার মূল ও যথাযথ প্রয়োগের প্রবণতা বিরোধী দলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

৫ম জাতীয় সংষদে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং সরকারকে গতিশীল করতে বিরোধী দলও উদ্যোগীমূলক ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সংসদে সরকারী উদ্যোগে মোট ২০৯টি বিলে নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিল সমূহের মধ্যে ১৭২টি বিল সংসদ কর্তৃক পাস হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের কার্যপ্রণালী বিধির ৭২ (১) বিধি অনুযায়ী কোন বেসরকারী সদস্য বিল উত্থাপন করতে চাইলে তাকে সচিবের নিকট পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং কেবলমাত্র বেসরকারী কার্য দিবসেই বেসরকারী বিল উত্থাপন করা যাবে। পঞ্চম সংসদে বেসরকারী সদস্যদের উদ্যোগে মোট ৮২টি বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২০.৭% বিল সংসদে উত্থাপিত হয় এবং উত্থাপনের জন্য অপেক্ষমান ছিল ২০.৭%। প্রথম পাঠের পর ১২.৩% বিল নাকোচ হয়ে যায়। ৯.৮% বিল কমিটিতে ফেরত পাঠান হয়। ৭.৩% তামাদি হয়ে যায় এবং ২১.৯% বিলের ব্যাপারে অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পঞ্চম সংসদে ১২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ১টি বিল অষ্টম অধিবেশনে সর্বসম্মতিভাবে সংসদে গৃহীত হয়। বিলটি হচ্ছে ... The members of parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 1993. সুতরাং বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সরকারি বিলের পাসের হার ৯৩.৪৮% বেসরকারী বিলের পাসের হার ০.১২%। মূলতঃ পাসকৃত বেসরকারী বিলটি সংসদ সদস্যদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

মূলতঃ বেসরকারী সদস্যদের বরাদ্দ সময়ের স্বল্পতা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই সুযোগকে সীমিত করে ফেলেছে। কার্যপ্রণলী বিধি অনুসারে কেবলমাত্র বৃহস্পতিবার বেসরকারী কার্যাবলী "প্রাধান্য" পাবে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজনে উক্ত দিনে অন্যান্য কাজ চলতে পারে। তাছাড়া, বেসরকারী দিবসে বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সাধারণ আলোচনা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় উপস্থাপিত হওয়ায় সপ্তাহের একটি দিনে বিল উত্থাপনের জন্য সময় ও সুযোগ অনেক কমে যায় তাছাড়া, সময়ের তুলনায় বিলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ব্যালটের মাধ্যমে বিলের প্রাধান্য নির্ণয় করতে হয়। যার ফলে অনেক সময় বস্তুনিষ্ঠ বিল উত্থাপিত হতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেসরকারী সদস্যদের উত্থাপিত বিল সমূহের ভাগ্য নির্ধারিত না

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ায় এবং সরকারী সদস্যদের অসহযোগীতামূলক মনোভাব প্রভৃতি কারণে বেসরকারী সদস্যগণ বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। বেসরকারী সদস্যদের উত্থাপিত বিল সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে পরিণত না হতে পারলেও দলীয় কার্যসূচী প্রকাশ ও জনমত গঠনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে।

বি.এন.পি সরকার রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জরুরী নয়, এমন কিছু আইনও সংসদকে পাস কাটিয়ে জারি করেন এবং পরে পাশ করিয়ে নেয়া হয়। যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি ও পাস করিয়ে নেয়। অধ্যাদেশের দ্বারা প্রণীত পনেরটি আইনের ওপর বিরোধী সংসদ সদস্যরা ব্যাপকভাবে সমালোচনা ও বিরোধীতা করে বিভিন্ন সময়ে ওয়াক আউট করেন। পঞ্চম সংসদের ৪র্থ অধিবেশনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যরিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার কর্তৃক "The Local Government (Upazilla Parishad and Upazilla Administration Reorganization) (Repeal) Bill, 1992" অধ্যাদেশ সংক্রান্ত বিলটি সংসদে উত্থাপিত হলে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় তারা বিলটিকে জনমত যাচাই এর জন্য তাদের অভিমত পেশ করেন এবং এ প্রসঙ্গে দশজন সদস্য তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন কিরোশগঞ্জ-৪ আসনের আওয়ামীলীগ সদস্য ড. মোঃ মিজানুল হক তার বক্তব্যে বলেন "আজকের নির্বাচিত সরকার সোজাসোজি আমলাতন্ত্রকে নিয়ে এসেছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সরিয়ে দিয়েছেন। শেরপুর-২ আসনের আওয়ামীলীগ সংসদ বেগম মতিয়া চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন "তিন জোটের যে ৫দফা ছিল, সেখানে আমরা জনগণের কাছে বলেছিলাম, যে উপজেলা করি আর না থানা পরিষদ করি, সেগুলো ঠিক হবে সংসদে এবং জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেদিন স্বৈরাচারী সরকার.....এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি করেছিল। আজকে একটি নির্বাচিত সরকার.....এর মাধ্যমে তা বাতিল করেছেন। তাহলে ঘটনাটা কি দাড়াল?

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন বিল উত্থাপনের বিরোধীতা করে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন-আজকে যে বিলটি আনা হয়েছে এর সব কিছু যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় তাহলে একটা কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক, মানবতা বিরোধী, জাতিসংঘের স্বীকৃত মানবাধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

"পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক চাকুরী শর্তাবলী অধ্যাদেশ নং ৯, ১৯৯৩-অধ্যাদেশটি অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন সংসদ সদস্য শুধাংশু শেখর হাওলাদার। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন প্রতি ১০ দিন অন্তর একটি সরকারকে পাশ করতে হয়। বিরোধী দল কর্তৃক শতকরা ১৪ ভাগ অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে অননুমোদন প্রস্তাব আনীত হয়। প্রায় ৩ বছর হয়ে গেল এ সরকারের হিসেব করলে দেখা যায় যে, প্রতি ১০ দিনের মাথায় ১টি করে....জারী করেছেন। পার্লামেন্ট অকার্যকর করার যত রকমের চেষ্টা তা হচ্ছে। সরকারের উত্থাপিত অধ্যাদেশ সমূহ যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর এবং সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়; তথাপি বিরোধী দলের ব্যাপক সমালোচনা এবং অধ্যাদেশ অনুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পার্লামেন্টারী সংস্কৃতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য ১৯৯১ সালের এপ্রিল হতে ১৯৯৪ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৯২টি অধ্যাদেশ উত্থাপিত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ত্রয়োদশতম অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দল মোট ৭৬বার ওয়ার্ক আউট করেছে। ৪১.৬% ওয়াক আউট সংগঠিত হয়েছে স্পীকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৮.১% সরকার কর্তৃক আনীত এবং পাশকৃত বিল সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীদের উক্তির কারণে, এছাড়া সরকারের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধী দলের আনীত বিল বা সংশোধনী অনুমোদন ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যথাক্রমে ১৮.১% ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটেছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যান্য সংসদ সমূহের তুলনায় এ সংসদে বিরোধীদলের সংখ্যাগত অবস্থান, তবে ত্রয়োদশ অধিবেশন হতে বিরোধী দলের ওয়াক আউট, পরবর্তীতে লাগাতার সংসদ বয়কটে রূপান্তরিত হয়। ফলে ১৯৯৪ এর ১লা মার্চ থেকে ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

এর ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত পঞ্চম জাতীয় সংসদ একটি একদলীয় সংসদে পরিণত হয়। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন।

বাংলাদেশের কোন দল নির্বাচনে পরাজিত হলে তাতে যেমন কারচুপির অভিযোগ তোলে তেমনি বর্জন করতে থাকে সংসদ। ৫ম সংসদের সময় কালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিরোধী দল শুধু সরকারের বিরোধিতাই করে গেছে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারেরই একটি অংশ যদি তারা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধীদলের ভূমিকা থাকে সরকারের প্রতিপক্ষ হিসেবে সরকারের সব কাজের বিরোধিতা করা।

৭.৪ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উত্থাপন। ১৯৯২ সালের ৫ আগষ্ট জাতীয় সংসদ সবিচালয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৫১ ধারার উপ বিধি (৩) অনুসারে মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন নোটিশ প্রদান করেন বিরোধীদলের পক্ষ থেকে আওয়ামীলীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ, জাসদ (সিরিজ) এর জনাব শাহজাহান সিরাজ, ওয়ার্কাস পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, সিপিবির জনাব সামসুদ্দোহা, জাতীয় পার্টির জনাব মনিরুল হক চৌধুরী গণতন্ত্রী পার্টির জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব দেন। ন্যাপের পক্ষ থেকেও একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়া হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে বলা হয় যে, "দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সরকার সে পরিস্থিতির যথোপযুক্ত মোকাবিলা করে জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরোধ ও ছাত্র ছাত্রী এমন কি শিশু কিশোরদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান চাঁদাবাজ, মাস্তানদের

Dhaka University Institutional Repository

হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সরকার অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্ট নৈরাজ্য দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের দলীয় করণ নীতির পরিণতিতে শিল্পাঞ্চলে ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়নে হাইজ্যাক, টার্মিনাল দখল, কলোনী দখলের ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকার সাংবাদিক ও সংবাদ পত্র কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত স্বশস্ত্র তৎপরতা ও ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ঘটনা প্রতিরোধের সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী বিদেশী দূতাবাসেরও নিরাপত্তা বিধানেও ব্যর্থ হয়েছে যে কারনে বিদেশেও দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে।

সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব ৯ আগষ্ট (১৯৯২) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল কর্তৃক ইতিপূর্বে দাখিলকৃত ৭টি নোটিশের বক্তব্য ও ভাষা এক ও অভিন্ন হওয়ায় মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক নোটিশ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নোটিশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৫৯ (৪) অনুযায়ী এ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন "নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সুসংহত করার স্বার্থে এবং সর্বোপরি জনগণের মানসিকতাকে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনাস্থাটি গৃহীত হল। মাননীয় স্পীকার ১২ আগষ্ট ১৯৯২ এ আলোচনার দিন নির্ধারণ করেন। আলোচনার সময়সীমা উভয়পক্ষের মধ্যে ১২ ঘন্টা ৬ ঘন্টা, ৬ ঘন্টা করে নির্ধারণ করা হয়। মোট ৫২ জন সংসদ সদস্য এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী তার বক্তব্যে বলেন "আইন শৃঙ্খলার অবনতী, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বৃদ্ধি, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেন্দ্র করে উদ্ভুদ সমস্যা প্রভৃতি কারণে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজকে ঘোষণা করছি বি.এন.পি-র ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব আমরা বিরোধী দল থেকে নিতে পারি না মাননীয় স্পীকার। কাজেই আজকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতা অদক্ষতা, অব্যবস্থা, দলীয়করণ ও সন্ত্রাস করে জন জীবনের যে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে সেখানে আমরা কোনদিন তাদেরকে সহযোগীতা করতে পারি না। তারই কারণে জনতার যে অভিমত সে অভিমতের প্রতিফলন ঘটিয়েই আজ এ অনাস্থা আমরা এনেছি। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের অভিযোগের উপর সে তার যে বক্তব্য রাখেন তার উল্লেখযোগ্য অংশ হলো গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ছিনতাই, হাইজ্যাক ও অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরোধী দলের অভিযোগের উত্তরে বেগম খালেদা জিয়া বলেন "দীর্ঘ ৯ বছর যে স্বৈরাচার জেকে বসেছিল সেই স্বৈরাচারই সন্ত্রাসকে লালন করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। এ অবস্থায় রাতারাতি কি সব হাইজ্যাক বন্ধ হয়ে যাবে? সেটি কখনও সম্ভব নয়।

দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান বি.এন.পি চায়না বলে বলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কার সৃষ্টি? আওয়ামীলীগ যখন স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় ছিল তখন তারা বলেছিল, পার্বত্য অঞ্চলে সকলেই বাঙ্গালী। সকলকে জোর করে বাঙ্গালী করা হয়েছে। তখন থেকেই তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। আমরা বলতে চাই যে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান চাই, এরই মধ্যে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি। দলীয়করণের অভিযোগ সম্পর্কে বেগম জিয়া বলেন, "দলীয়করণ কি জিনিস তা আমরা জানি না। আমরা সকলকে সমান সুযোগ দিই। আপনারা তা দেখেছেন। আপনাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট হচ্ছে। ব্রীজ হচ্ছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, আজকে আমরা সংসদীয় পদ্ধতি চালু করিনি। এ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য, সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য আমরা সম্পদের সমান বন্টন করেছি। সে ভাবে আমাদের উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছি। বেগম জিয়া আরও বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের গণতন্ত্র শিখাবেন আমরা তাদের একদলীয় গণতন্ত্র শিখতে চাই না। বরং শহীদ জিয়াউর রহমান-ই তাদেরকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছি।

কিন্তু নির্বাচনের মধ্যে সেইতো কেবল জনগণের রায় বা অভিপ্রায় প্রতিফলন ঘটে। তিনি বলেন বি.এন.পি হচ্ছে জনগণের দল। জনগণের কাছে বি.এন.পি যে সব ওয়াদা করেছে তা পর্যায়ক্রমে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

Table-16: Statement of Promises extracted and Implemented (Fifth JS)

Party	Promises Extracted N=348	Promises Implemented N=348
B.N.P	19.3	17.4
Al	49.1	52.0
JP	10.6	7.1
JIB	14.4	14.3
Other	6.6	9.2
Total	100.0	100.0

Source: (Bangladesh National Parliament: 1995)

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে বি.এন.পি সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। বিভক্তি ভোটে প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১২২টি ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ১৬৮টি ভোট। জামায়াত ভোট দানে বিরত থাকে। ভোট গ্রহণের সময় জাতীয় পার্টির ৪ জন, ইসলামী ঐক্য জোটের ১জন, এন.ডি.পি-র ১ জন, আওয়ামীলীগের ৫ জন এবং ২ জন স্বতন্ত্র সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আওয়ামীলীগের দুজন সংসদ সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

ইত্তেফাল করায় তাদের আসন শূণ্য ছিল। বি.এন.পি-র ব্যরিষ্টার জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে থাকায় এবং শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার পদে থাকায় ভোট দেননি। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় থাকায় বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাবর ফলে বি.এন.পি সরকারের পতন বা সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যাহত হয় নি।

৭.৩ সপ্তম জাতীয় সংসদি নির্বাচন ও ফলাফল

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ইতহাসে একটি মাইলফলক বিশেষ। কেননা সর্বপ্রথম সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন ১১৯টি রাজনৈতিক দলকে প্রতীক প্রদান করলেও ৮১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এর মধ্যে চারটি দল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

২০ মে ১৯৯৬ আওয়ামীলীগ তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টু প্রকাশ করে। এ রাজনৈতিক দলটি মূলত: স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাব দিহিমূলক বা দায়িত্বশীল সরকার গঠণ, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা, উপজেলা ব্যবস্থার পুন:প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টুতে সংবিধানের চারটি মূলনীতির সংরক্ষণ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, অবাধ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ইউনিয়ন পরিষদের সংস্কার এবং গ্রাম সরকারের সূচনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পার্টি বিশেষত: উপজেলা পরিষদের সূচনা, নির্বাচিত জেলা পরিষদ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

জামাত-ই-ইসলামী তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টুতে ইসলামিক আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কথা উল্লেখ করে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচন কেবল মাত্র বাংলাদেশেই নয় আন্তর্জাতিক ভাবেও ব্যাপক আলোড়ন সৃত্রপাত করে। কেননা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে আসে। এ নির্বাচনে প্রসঙ্গে Common Wealth Secretariat-এর রিপোর্টে বলা হয়-"The conditions existed for a free expression of will by the voters and the results reflected the wishes of the people of Bangladesh. Overall this was a credible election."

১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল ৭৩% যা ৯১' এর নির্বাচকদের উপস্থিতির হারকে অতিক্রম করেছে (৫৫.৩৫%)। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামীলীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এবং বিএনপি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এবং জাতীয় পার্টি ও জমায়েত ই-ইসলামী পর্যায়ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে আসে।

টেবিল-১৭: সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল/স্বতন্ত্র	আসনে প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রাপ্ত আসন	শতকরা অবস্থান
আওয়ামীলীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪
বাংলাদেশ	৩০০	১১৬	৩৩.৩

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী দল			
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	১৬.১
জামায়েত-ই-ইসলামী	৩০০	৩	৮.৬
ইসলামী-ঐক্য-জোট	১৬৫	১	১০.০
জাসদ (রিব)	৬৭	১	০.০
বাংলাদেশ কমিনিষ্ট পার্টি	৩৬	০	০.০
ওয়ার্কাস পার্টি	৩৫	০	০.০
ফ্রিডম পার্টি	৫৫	০	০.০
গণতন্ত্রী দল	১৩	০	০.০
জাতীয় আওয়ামী পার্টি	১৩	০	০.০
স্বতন্ত্র	৩৫০	১	১০.০

উৎস: Dhaka Courier (1996).

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের ইতিহাসে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন (৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন) নির্বাচন একটি অন্যতম ঘটনা। এছাড়া দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত রেকর্ড সংখ্যক বিদেশী পর্যবেক্ষক ছিলেন। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথ, মার্কিন ভিত্তিক এন.ডি.আই, এশিয়া প্রতিনিধিসহ আরও কয়েকটি দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধি।

টেবিল-১৮: শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের প্রথম মন্ত্রিসভা

মন্ত্রীদের নাম	মন্ত্রণালয়
১। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২। জনাব জিল্লুর রহমান	স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩। জনাব এ এম এস কিবরিয়া	অর্থমন্ত্রণালয়
৪। জনাব এ.এস.এইচ.কে সাদেক	শিক্ষা প্রাথমিক ও গনশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৫। জনাব আবদুর রাজ্জাক	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৬। জনাব তোফায়েল আহমেদ	শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭। লেঃজেঃ (অবঃ) নুরুদ্দিন খান	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮। মেজার (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৯। মোহাম্মদ নাসিম	ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১০। বেগম মতিয়া চৌধুরী	কৃষি, খাদ্য, ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১। জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রীদের নাম	মন্ত্রণালয়
১। ডঃ মোজাম্মেল হোসেন	মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

২। জনাব ওবায়দুল কাদের	যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩। জনাব আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪। মি. ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫। আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৬। মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭। জনাব আফছার উদ্দিন আহমদ খান	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮। অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৯৬ সালের ২৯শে জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মন্ত্রিপরিষদের আরও ২জন মন্ত্রী ও ৪ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেন। এরা হলেনঃ

মন্ত্রী	মন্ত্রণালয়
১। জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। জনাব আ.স.ম আবদুর রব	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রীদের নাম	মন্ত্রণালয়
১। জনাব এ.কে ফজলুল হক	পাট মন্ত্রণালয়
২। জনাব এম.এ, মান্নান	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
৩। জনাব মোহাম্মদ হাজী রাশেদ মোশাররফ	ভূমি মন্ত্রণালয়
৪। অধ্যাপক আবু সাইয়িদ	তথ্য মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

৭.৪ সপ্তম জাতীয় সংসদ ও বিরোধীদল

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সপ্তম জাতীয় সংসদ একটি প্রকৃত সংসদীয় ব্যবস্থার রূপ রেখা নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। সপ্তম জাতীয় সংসদে ৩৩০ সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৫৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য বা মোট সদস্যদের ৪৬.৯৭ বা ৪৭% এবং সরকার দলীয় সদস্য হচ্ছে ১৭৫ জন বা মোট সদস্যের ৫৩.৩%। অর্থাৎ সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থানগত ব্যবধান ৬.০৩% ফলশ্রুতিতে পঞ্চম সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দলের কার্যকরী অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সরকারকে প্রশ্ন, দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব, বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরী আলোচনা, প্রভৃতির মাধ্যমে বিরোধী দল সপ্তম সংসদকে গতিশীল করে তোলে।

টেবিল-১৯ : বাংলাদেশর ১মষ্ঠ সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদের মেয়াদকাল, মোট অধিবেশন ও মোট কার্য দিবসের পরিসংখ্যান।

অধিবেশন	মেয়াদ কাল	মোট অধিবেশন	মোট কর্ম দিবস
প্রথম অধিবেশন	২ বছর ৭ মাস	৮টি	১৩৪ দিন
দ্বিতীয় অধিবেশন	৩ বছর	৮টি	২০৬ দিন
তৃতীয় অধিবেশন	১ বছর ৫ মাস	৪টি	৭৫ দিন
চতুর্থ অধিবেশন	২ বছর ৮ মাস	৭টি	১৬২ দিন
পঞ্চম অধিবেশন	৪ বছর ৭ মাস	২২টি	৩৯৫ দিন
ষষ্ঠ অধিবেশন	৭ দিন	১টি	৩৫২ দিন

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের নীতি সমূহকে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদীয় কমিটিকে সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ধরে নেওয়া হয়। সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এবং অর্থ সংক্রান্ত কমিটি সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূহের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৮ মে সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় মন্ত্রীর পরিবর্তে কোন সাংসদকে চেয়ারম্যান করার বিধি সম্বলিত নতুন বিধান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সভায় আওয়ামীলীগ সদস্য আ. খ. ম. জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রস্তাক্রমে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধির পরিবর্তে নতুন বিধি সংযোজন করে কার্য প্রণালী বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ জন থাকবে। সভাপতি ও সদস্যগণ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে কোন মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হবেন না। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর কেউ মন্ত্রী হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার সাথে সাথে সভাপতির পদ হারাবেন। সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কমিটির সদস্য হবেন। সংসদ সদস্য না হলেও তারা কমিটির সদস্য হতে পারবেন। কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না। সাংসদ হলে কমিটিতে তার ভোটাধিকার থাকবে অন্যথায় নয়। বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় এ সংস্কার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কেননা এর ফলে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূহের উপর মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং ব্যাকবেঞ্চ সাংসদদের কাজ করবার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহে কোন মন্ত্রী সাধারনত সভাপতিত্ব করেন না।

সংসদীয় বিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারী দলের Backbencher এমপিরা বেসরকারী সদস্য । তাদের প্রধান কাজ হলো সরকারী সদস্য অর্থাৎ মন্ত্রিভার সদস্যদের জবাবদহিতা নিশ্চিত করতে এক যোগে কাজ করা। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি দলীয় সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের কোন মানসিকতা বিকাশ লভ করেনি। পার্লামেন্টেটারিয়ান আবদুল মঈন খান বলেন- It has to be understood that in our form of government, all members whether belonging to the opposition or treasury bench are non-government members, only government members in the

Dhaka University Institutional Repository

parliament being those holding ministerial offices. They are morally duty bound and pledged to the people of this country as their representatives to discharge their responsibilities with the objective of not only serving the party alone but first and formost to fulfill their commitment to our people and our country."(Khan, Abdul Moyeen: 1999)

সপ্তম জাতীয় সংসদের এয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য দল মোট ৫১ বার ওয়াক আউট করে এবং এর মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ৩৯ বার ওয়াক আউট করেন।

টেবিল-২০:৭ম জাতীয় সংসদে ওয়াক আউটের পরিসংখ্যান

সংসদ অধিবেশন	ওয়াক আউটের সংখ্যা	প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউট	কারণ
প্রথম অধিবেশন	৬	৪	অধিকাংশ ওয়াক আউট সংগঠিত হয় সংসদে আলোচনা বা বক্তব্য প্রদানে সুযোগ না দেওয়ায়।
দ্বিতীয় অধিবেশন	১	১	
চতুর্থ অধিবেশন	১	১	বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না দেওয়ার
পঞ্চম অধিবেশন	৪	৩	-
৬ষ্ঠ অধিবেশন	১	১	-
সপ্তম অধিবেশন	২	১	-
অষ্টম অধিবেশন	১৫	১১	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল ৯৮ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

			সরকার (সংশোধনী বিল ৯৮) বিল সমূহের উপর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না দেওয়ার
নবম অধিবেশন	৩	২	
দশম অধিবেশন	-	-	
একাদশ অধিবেশন	৩	জামায়ত ইসলামী ওয়াক আউট করেন	সংসদে বক্তব্য প্রদানে বাধা এবং বন্যা উত্তরে পূণর্বাসন সংক্রান্ত বিল উত্থাপনে বিরোধীতা করে।
দ্বাদশ অধিবেশন	৭	৬	বক্তব্য প্রদানে অধিকাংশ ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটে ফ্লোর সংক্রান্ত বিষয়ে।

উৎস : সপ্তম-এয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বুলেটিন সমূহ হতে সংগৃহীত

Table-21: Statement of Walk outs

Reasons	% of Walt outs		
	Fifths JS N = 76	Seventh JS N = 61	Total N= 137
Protesting the introduction and adoption of bills and resolutions	18.1	9.8	14.3
Protesting the remarks of ministers	6.9	9.8	8.3
Protesting the decisions (lapse of government)	9.7	-	5.3
Protesting the refusal of	5.6	14.8	9.8

Dhaka University Institutional Repository

government not to accept demands/ amendments to bills			
Protesting the decision of the Speaker			

1. Not to give the floor to the opposition outside the rules	18.1	6.6	12.8
2. Not to allow adjournment	5.6	3.3	4.5
3. Not to allow making statements	1.4	19.7	9.8
4) Others	16.5	29.5	22.6
Others	18.1	6.5	12.6
Total	100.0	100.0	100.0

Source : Bangladesh National Parliament (1991-94 b, 1996-99)

সপ্তম জাতীয় সংসদে সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হচ্ছে এ সংসদ পূর্ন পাঁচ বছর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। তারপরও একে কার্যকর সংসদ বলা যায় না। কেননা সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন হতে বিরোধীদল সমূহ সংসদ অধিবেশনে আর অংশ গ্রহণ করেনি। বিরোধী দল বিহীন সংসদ কখনই কার্যকর হতে পারে না। ৭ম জাতীয় সংসদের সময়কালে আওয়ামীলীগ দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করে। পার্বত্য শক্তি চুক্তি যা করা হয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে। এই চুক্তির বিরোধিতা করে বিরোধীদল গুলো সংসদকে বর্জনসহ নানা কর্মসূচী পালন করে । ৭ম সংসদের শেষ দিকে বি.এন.পি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ঘেরাও এর মত কর্মসূচী পালন করে বা নানা ধ্বংসাত্বক কর্মকান্ডের জন্ম দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৮

৮ম সংসদ ও বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ২৮শে অক্টোবর ৮ম সংসদ তার যাত্রা শুরু করে। এ সংসদের শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা অক্টোবর ২০০৬। ৭ম সংসদের মত ৮ম সংসদও তার পূর্ণমেয়াদ অর্থাৎ ৫ বছর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী ৫ম ও ৭ম সংসদের ন্যায় এ সংসদেও দীর্ঘ সময় বিরোধী দলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ৮ম জাতীয় সংসদে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কার্যক্রম সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই সংসদে পাশ হয়েছে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী। যা নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে ১৪ জুলাই ২০০১ তারিখে সংসদ ভেঙ্গে যায় এবং সেদিনই রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোঃ লতিফুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগদান করেন। তাই ঘোষণা অনুযায়ী অর্থাৎ নিয়োগ লাভ করার পর প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট শপথ বাক্য পাঠ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন- "সংবিধানে প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।" সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে সফল করতে হলে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন খুবই জরুরী। প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন। "সারা দেশে যে বিপুল পরিমান অবৈধ অস্ত্র রয়েছে তা উদ্ধার করা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা কঠিন হবে।" ২০০১ সালের ১৬ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় এবং তারা শপথ বাক্য পাঠ করেন। নিম্নে উপদেষ্টাদের নাম ও দফতর সমূহ উল্লেখ করা হল:

টেবিল-২২:২০০১ সালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও দপ্তরসমূহের তালিকা

উপদেষ্টাগনের নাম	দফতর সমূহ
১। ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২। বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রাণালয়
৩। মোঃ জেঃ (অবঃ) মঈনুল হোসেন	শিল্প, বাণিজ্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী	
৪। মোহাম্মদ হাকিম উদ্দিন	অর্থ, পরিকল্পনা, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়
৫। সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী	কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন এবং শিপিং মন্ত্রণালয়
৬। বিগ্রেডিয়ার (অব:) আব্দুল মালেক	স্বাস্থ্য ও ধর্ম মন্ত্রণালয়
৭। এ. এস. এম শাহজাহান	শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৮। আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী	তথ্য, গৃহায়ন, গণপূর্ত বন ও পরিবেশ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়
৯। রোকেয়া আফজাল রহমান	মহিলা ও শিশু, সমাজকল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০। এ.জে. এম আমানুল ইসলাম চৌধুরী	জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ লতিফুর রহমান যেসব মন্ত্রণালয় তাঁর নিজের হাতে রাখেন সেগুলো হলো:

১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৩। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫। নির্বাচন কমিশন এবং

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী এ সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থাকে রাষ্ট্রপতির হাতে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ লতিফুর রহমান তাঁর কার্যকালের শুরুতেই শেখ হাসিনা সরকারের প্রশাসনিক গঠন ভেঙ্গে একটি নতুন গঠনের সূচনা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ৬ জন সিভিল সার্ভেন্টকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। শুধু প্রশাসনের ক্ষেত্রেই নয় পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীতে যারা আনুগত্য এবং দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ লাভ করেছিলেন তাদেরকে তিনি বদলি করেছেন। ফলশ্রুতিতে দেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা কমে আসে এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রতি জনগনের আস্থা বেড়ে যায়। প্রশাসনিক রদবদলের একটি পরিসংখ্যান নিম্ন দেয়া হল:

টেবিল-২৩: লতিফুর রহমানের সময় প্রশাসনিক রদবদলের পরিসংখ্যান

সরকারী আমলা	সংখ্যা
সচিব	২৮ জন
অতিরিক্ত সচিব	১৯ জন
যুগ্ম সচিব	৩৭ জন
উপ-সচিব	৭৭ জন
সহকারি সচিব	৫৬ জন
বিভাগীয় কমিশনার	৬ জন
জেলা প্রশাসক	৪৩ জন
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	৪ জন
ইউ, এন ও	১৬০ জন
অতিরিক্ত আইজি	৪ জন
ডি. আই . জি	৮ জন
অতিরিক্ত ডি.আই.জি	৫ জন
পুলিশ সুপার	৪৪ জন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	১২ জন
ওসি	৫৩৮ জন

দায়িত্ব গ্রহনের পর প্রধান উপদেষ্টা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দেশের ভেতর থেকে সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জোর তৎপরতা চালান। সেই জন্যে ১৮ জুলাই থেকে ২২ আগষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

(২০০১) পর্যন্ত ৩৬ দিন ব্যাপী অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশী অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে ৩১৭৮ টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ মোট ৬৮ হাজার ৭৭ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতার কৃতদের মধ্যে পুলিশের ভাষা অনুযায়ী ১০৭৩ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং ৪৪০৪২ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয় যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল। এছাড়া প্রায় ৭ হাজার গুলি এবং ৭০ হাজার বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়।

শেখ হাসিনার সরকার যাবার আগে রেখে যান বিশাল অর্থ সংকট। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে আসে ১০৫ কোটি আমেরিকান ডলারে এবং এটি ছিল গত ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম ডলার রিজার্ভ। তত্ত্বধায়ক সরকার হাসিনা সরকারের প্রতিশ্রুত অনেক বৈদেশিক পেমেন্ট স্থগিত করেন। হাসিনা সরকার টিভি ও বেতার মাধ্যমকে নিজের ছকে সাজিয়েছিলেন। হাসিনা সরকার তার শেষ সপ্তাহে ঘন্টার পর ঘন্টা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বিটিভিকে ব্যবহার করেছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভোটার তালিকায় প্রচুর ভূয়া ভোটার ছিল। ঐ ভোটার তালিকা তত্ত্বধায়ক সরকার দ্রুত সংশোধন করেন। তাছাড়া নির্বাচনী আদেশ দেয়া হয় যে, ভোটের দিনে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধাদানকারীদের ৩ থেকে ১০ বছরের জেল হবে। তত্ত্বধায়ক সরকার সামরিক বাহিনীতেও রদবদল করেছিলেন।

যাহোক, তত্ত্বধায়ক সরকারের হাতে সময় খুব কম ছিল। সকল সমস্যা সমাধান ও সংকট উত্তরণের পরেই কোন একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব ছিল। সময়ের স্বল্পতা বিবেচনা করে বিচারপতি লতিফুর রহমান শনিবারেও অফিস করেন। তত্ত্বধায়ক সরকারের লক্ষ্য ছিল একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত দক্ষভাবে সরকার পরিচালনা করা। তাই তত্ত্বধায়ক সরকার ঘোষিত ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১ ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ফলাফল

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০০১ সালের নির্বাচনকে একটি পরিকল্পিত এবং জোট ভিত্তিক নির্বাচন বলা যায়। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কিভাবে নির্বাচনে জেতা সম্ভব এই বিষয় নিয়ে বিরোধী দলসমূহ নানামুখী চিন্তা ভাবনার মধ্যদিয়ে ৪ দলীয় জোট গঠিত হয়। ১৯৯১ সালের মত এই জোট কোন গোপন সমঝোতা কিংবা অপরিকল্পিত ছিল না। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে সরকারের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই জোট গঠিত হয় এবং সরকার বিরোধী নির্বাচনমুখী আন্দোলন শুরু করে । আন্দোলনের মাঝপথে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টায় এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি জোট ত্যাগ করলেও দলটি পুনরায় বিভক্তি হয়ে নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে একটি অংশ আওয়ামী লীগ বিরোধী এই জোটে যোগদান করে। এই সময় থেকে নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত এই জোট আওয়ামী লীগ বিরোধী নির্বাচনী জোট হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অপরদিকে নির্বাচনী পরিকল্পনায় আওয়ামী লীগ হয়ত ক্ষমতাসীন থাকার কারণে একদিকে নিজের ভোট বৃদ্ধি অন্যদিকে জাতীয় পার্টিকে ৪ দলীয় জোট থেকে বের করে ত্রিমুখী নির্বাচনের আশা করেছিল। কিন্তু ক্ষমতা ত্যাগের সময় ৪ দলীয় জোটের শক্তিশালী অবস্থান, আওয়ামী লীগের এলাকা ভিত্তিক দলীয় নেতৃবৃন্দের বাস্তব অবস্থান, জাতীয় পার্টির পক্ষে তৃতীয় ফ্রন্টে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিরোধী জোটের ভোট বিভক্তি করা কতটুকু সম্ভব হবে বিষয়টি হয়ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ হিসাবের মধ্যে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২০০১ সালের এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি একাধিক ধারায় বিভক্ত হওয়ায় বাস্তবে দলটির জাতীয় অবস্থান অনেকাংশে হারিয়ে যায়। বর্তমানে শুধুমাত্র বৃহত্তর রংপুর জেলায় দলটি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এই অঞ্চলে ১৪টি আসন লাভ করেছে। ২০০১ সালের এই নির্বাচনে (২০০১ এর ভোট বৃদ্ধির হিসাব ছাড়াই) ৯৬ সালের প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে জাতীয় পার্টির সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপী প্রায় ২৮,০০০,০০ (আঠাশ লক্ষ) ভোট কমে যায়। এই ভোট কমার ক্ষেত্রে ৯৬ সালের প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় ২০০১ সালে জাতীয় পার্টির (এরশাদ)

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী ডিভিশনে প্রাপ্ত ভোট প্রায় সমান থাকলেও খুলনা বিভাগে ৫.৫ লাখ, বরিশাল বিভাগে ১.৩ লক্ষ, ঢাকা বিভাগে ১২.২ লাখ, সিলেট বিভাগে ২.৮ লাখ এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৬.২ লাখ কমে যায়। এই ভোট বিভক্তিতে ৪ দলীয় জোট ২০০১ সালের নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে লাভবান হয় বলে উল্লেখ করা যায়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় চট্টগ্রাম বিভাগে ৯৬ এর নির্বাচনে জামায়াত-বিএনপির দলের মোট যুক্ত ভোট ছিল ৪৭.২৬%। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনে ৪ দলীয় জোটের ভোট বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৫৬.৩৫%। দেখা যায় এই বিভাগে জোটের ৯.০৯% ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জাতীয় পার্টির ৯৬ সালের নির্বাচনে এই বিভাগে প্রাপ্ত ভোট ছিল ১১.৬৯%। ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে দেখা যায়, জাতীয় পার্টি এরশাদ এই বিভাগে ২.১৬% ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ ৯.৫৩% কমে গেছে এবং এই ভোট জোটের সাথে যুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এই বিভাগে আওয়ামী লীগের দলীয় ভোট উভয় নির্বাচনে ৩৬% শতাংশে স্থিত থেকেছে।

একইভাবে দেখা যায়, ৯৬ এর নির্বাচনে বরিশাল বিভাগে বিএনপি-জামায়াত দলের মোট ভোট ছিল ৪০.৬২%। ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত এই ভোট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮.৭৬%, অর্থাৎ ৮.১৪% ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে জাতীয় পার্টির ৯৬ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট ছিল ১৪.৫৭% এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে এই ভোট কমে দাড়িয়েছে ৬.৮৭%। অর্থাৎ ৭.৭০% ভোট কমে গেছে এবং এই ভোটে জোটের সাথে যুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। একই সময়ে এই বিভাগে উভয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট ৩৬% শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। রাজশাহী বিভাগ বাদে জাতীয় পার্টির অন্যান্য সকল বিভাগের ভোট ফলাফলের এই চিত্র দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২০০১ সালের নির্বাচনের ভোট বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতীয় পার্টি বিভক্ত না হলে সার্বিকভাবে ৪ দলীয় জোটের আসন সংখ্যা ২৬৫ আসনে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। একই সময়ে ৯৬ এর ভোট ফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগ অবিচ্ছিন্ন জাতীয় পার্টির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বিএনপি জোটের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে ২০০১ সালের নির্বাচনে এই জোটের আসন নিরাপদ ২০২ উন্নীত হতে পারত। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান পর্যালোচনায় বলা যায় আগামী দিনের নির্বাচন সমূহ নির্বাচনী জোটের উপর নির্ভরশীল হবে এবং সমমনা অথবা সম-আদর্শিক দল সমূহ জোটবদ্ধ হয়ে দ্বিমুখী নির্বাচনে সীমাবদ্ধ থাকবে। ২০০১ সালের এই নির্বাচন পর্যালোচনা গাণিতিক হিসাবের উপর নির্ভর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সকল নির্বাচন ফলাফল এই গাণিতিক হিসাবে প্রতিফলিত হবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। ৫৪, ৭০ এবং ৯৬ এর নির্বাচন ফলাফলে এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়ে আছে। তবে গাণিতিক হিসাব নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান ভিত্তিভূমি হবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল চাবিকাঠি। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনই ছিল নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে বাংলাদেশে ২য় নির্বাচন। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৯ টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোট ১৯৩৩ জন প্রার্থী। রাজনৈতিক দল ছিল ৫২টি। এই নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বি.এন.পি'র নেতৃত্বে চারদলীয় জোটে (বি.এন.পি, জাতায়েত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্য জোট) নির্বাচনে অংশগ্রহণ। কক্সকাবাজার-৩ আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

টেবিল-২৪ : ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থী:

দলের নাম	প্রতীক	প্রার্থী সংখ্যা
আওয়ামীলীগ	নৌকা	২৯৯
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	ধানের শীষ	২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

জামায়েত-ই-ইসলামী	দাঁড়িপাল্লা	৩১
জাতীয় পার্টি (এ) ই:ঐক্য ফ্রন্ট সহ	লাঙ্গল	২৮১
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	বাই সাইকেল	১৪০
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	কাস্তে	৭৬
কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি	গামছা	৩৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কস পার্টি	হাতুড়ি	৩২
অন্যান্য ও স্বতন্ত্র	-	৭০৫

উৎস: যুগান্তর ১-১০-২০০১

বি.এন.পি ঃ জাতীয় পার্টি (নাজিউর) + ইসলামী ঐক্য জোট:

এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭,৪৭,০৯৬৭৮ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ছিল ৩,৬১,৭৪,৭৭১ জন এবং পুরুষ ভোটার ছিল ৩,৮৫,৩৪,৯০৭ জন। একাধিক আসনে প্রার্থী ছিল ৩২ জন (৪৭টি আসনে) এবং মহিলা প্রার্থী ছিল ৩৭ জন। নির্বাচনের মোট ভোটার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৭৪.৮৭% যা ৭ম সংসদ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতির চেয়ে ছিল বেশী।

এ নির্বাচনে বি.এন.পি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এমনকি তারা মোট সংসদীয় আসনের দুই তৃতীয়াংশ আসনের বেশী লাভ করে। বি.এন.পি সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করে। তাদের আসন সংখ্যা ছিল ১৯১টি। আওয়ামীলীগ লাভ করে ৬২টি, জামায়েত ইসলামী ১৭টি, জাতীয় পার্টি (এ) ১৪টি, স্বতন্ত্র ৬টি এবং অন্যান্য দল ৮টি আসন লাভ করে। মুন্সিগঞ্জের একটি আসনের নির্বাচন স্থগিত করার কারণে মোট ২৯৮টি আসনের ফল পাওয়া যায়। এ নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যদিও কোথাও কোথাও গোলযোগের খবর পাওয়া গেছে। এ নির্বাচনে নৌকা ঠেকানোর জন্য গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-২৫:অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যার শতকরা হার
বিএনপি	২৫২	২২৮৩৩৯৭৮	৪০.৯৭	১৯৩	৬৪.৩৩
আওয়ামী লীগ	৩০০	২২৩৬৫৫১৬	৪০.১৩	৬২	২০.৬৭
ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট	২৮১	৪০৩৮৪৫৩	৭.২৫	১৪	৪.৬৭
জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ	৩১	২৩৮৫৩৬১	৪.২৮	১৭	৫.৬৭
জাতীয় পার্টি	১১	.৬১১৭৭২	১.১২	.৪	১.৩৩
ইসলামী ঐক্যজোট	৭	৩৭৬৩৪৩	০.৪৭	১	০.৩৭
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	২৬১৩৪৪	০.৪৭	১	০.৩৩
জাতীয় পার্টি (জেপি মঞ্জু)	১৪০	২৪৩৬১৭	০.৪৪	১	০.৩৩
স্বতন্ত্র	৪৮৬	২২৬২০৭৩	৪.০৬	৬	২.০০
মোট				৩০০	১০০

উৎস : জার্নাল এশিয়ান প্রোফাইল, অক্টোবর ২০০৪, ভলুম -৩২, নং ৫, পৃষ্ঠা-৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যার ফলশ্রুতিতে ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর মাধ্যমে অষ্টম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়।

টেবিল-২৬:খালেদা জিয়ার প্রথম মন্ত্রিসভা

পূর্ণ মন্ত্রীদের নাম	মন্ত্রণালয়ের নাম
১। বেগম খালেদা জিয়া (প্রধানমন্ত্রী)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন, প্রতিরক্ষা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক।
অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মোঃ সাইফুর রহমান	অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া	স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
আবদুল মতিন চৌধুরী	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
ডাঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	কৃষি মন্ত্রণালয়
চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়
এম. কে আনোয়ার	শিল্প মন্ত্রণালয়
তরিকুল ইসলাম	খাদ্য মন্ত্রণালয়
শাহজাহান সিরাজ	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

খুরশিদ জাহান হক	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আবদুল্লাহ আল নোমান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রকৌশলী এল কে সিদ্দিকী	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ডঃ মঈন খান	তথ্য মন্ত্রণালয়
মির্জা আব্বাস	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সাদেক হোসেন খোকা	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
আমীর খসরু মাহমুদ	বানিজ্য মন্ত্রণালয়
ব্যারিস্টার আমিনুল হক	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ (বীর বিক্রম)	পাট মন্ত্রণালয়
হারুনুর রশীদ খান মুন্নু	দফতরবিহীন
ডঃ ওসমান ফারুক	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রীদের নাম	মন্ত্রণালয়ের নাম
মোঃ লুৎফর রহমান খান	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
মোঃ ফজলুর রহমান পটল	যুব ও ক্রড়া মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

মোশাররফ হোসেন শাহজাহান	ধর্ম মন্ত্রণালয়
মেজর (অবঃ) মোঃ কামরুল ইসলাম	প্রবাসী মন্ত্রণালয়
রেদোয়ান আহমেদ	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শাহজাহান ওমর (বীর উত্তম)	ভূমি মন্ত্রণালয়
মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
রিয়াজ রহমান	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আলমগীর কবির	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
আনোয়ারুল করিব তালুকদার	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
জিয়াউল হক জিয়া	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম	পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এ কে এম মোশাররফ হোসেন	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সালাউদ্দিন আহমেদ	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ইকবাল হাসান মাহমুদ	বিদ্যুৎ বিভাগ মন্ত্রণালয়
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	কৃষি মন্ত্রণালয়
মোঃ বরকত উল্লাহ বুলু	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

শাহ মোহাম্মদ আবুল হোসাইন	অর্থ মন্ত্রণালয়
আমান উল্লাহ আমান	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
মোঃ আহসানুল হক মোল্লা	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
এবাদুর রহমান চৌধুরী	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়
এহসানুল হক মিলন	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মিজানুর রহমান সিনহা	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
উকিল আবদুস সাত্তার	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
জাকরুল ইসলাম চৌধুরী	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়

উপ-মন্ত্রীদের নাম	মন্ত্রণালয়ের নাম
মনি স্বপন দেওয়ান	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আসাদুল হাবিব (দুলু)	যমুনা সেতু বিভাগ
এ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
মোঃ আব্দুস সালাম পিন্টু	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৮.২ ৮ম জাতীয় সংসদ ও বিরোধী দল

২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। আর অষ্টম জাতীয় সংসদ তার যাত্রা শুরু করে ২৮ অক্টোবর। ১৯৯৬ সালের পর প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অষ্টম

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের শুভ সূচনা ঘটে। ২০০১ এর ২৮ অক্টোবর থেকে ২০০৬ এর ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত ২৩টি অধিবেশনে মোট ৩৭৩ কার্যদিবস ৮ম সংসদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একাদশতম অধিবেশন ছিল ৮ম সংসদের সবচেয়ে দীর্ঘতম অধিবেশন। ১৮ জানুয়ারি ২০০৪ অধিবেশন শুরু হয়ে শেষ হয় ১৭ মে ২০০৪। টানা ৪ মাসের ৪৩ কার্যদিবসের এ অধিবেশন দেশের ইতিহাসেও দীর্ঘতম অধিবেশন। এর আগে সংসদের দীর্ঘতম অধিবেশনের কার্যদিবস ছিল ৩৯দিন। ১০ম অধিবেশন ছিল সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ অধিবেশন শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০২, যার কার্যদিবস ছিল ৪টি। ৪র্থ অধিবেশনের কার্যদিবসও ৪টি ছিল। কিন্তু তার ব্যাপ্তিকাল ছিল বেশি। ১২ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত।

প্রধান বিরোধী দল ৩ দফায় প্রায় দেড় বছর সংসদে অনুপস্থিত থাকলেও সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চেয়ে বেশিদিন অধিবশনে হাজির ছিলেন বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনা। অষ্টম সংসদে বিরোধী দল বিভিন্ন ইস্যুতে মোট ১১৭ বার সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। কোরাম সঙ্কটের জন্য সংসদের বৈঠক ১০৯ দিন বিলম্বিত হয়েছে। বিঘ্নিত হয়েছে কার্যক্রম। এমনকি কোরাম সঙ্কটের কারণে সংসদের বৈঠক মূলতবি করতে হয়েছে ১৮ বার। সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকাকে দু' ধরনের প্রেক্ষিতে দেখা হয়ে থাকে এর একটি হচ্ছে"Proactive" বা উদ্যোগমূলক ভূমিকা এবং "Reactive" বা প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকা। বিরোধীদলীয় সদস্যগণ তখনই "Proactive" বা উদ্যোগমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় যখন তাদের জন্য আইন প্রণয়নমূলক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে সরকার কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত যেকোন নীতিমালার প্রতি বিরোধী দলের কেবলমাত্র সাড়া প্রদানমূলক আচরণকে তার "Reactive" ভূমিকা বলা হয়ে থাকে। ৩য় বিশ্বের অধিকাংশ নব্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বিরোধী দলের এরূপ প্রতিক্রিয়ামূলক ভূমিকাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের ৮ম সংসদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সময়েই বিরোধীদলীয় সদস্যগণ "Reactive" ভূমিকা পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-২৭: ৮ম জাতীয় সংসদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের তালিকা

নারী প্রতিনিধিত্ব শুন্য ছিল	১৭তম অধিবেশন পর্যন্ত
এ সংসদে সর্বমোট বিল পাস হয়েছে	১৮৫টি এর মধ্যে বেসরকারি বিল ছিল একটি।
৫বছরে আওয়ামীলীগ সদস্যারা প্রধানমন্ত্রীর নিকট পশ্নপএ জমা দিয়েছে	৯৯২টি কিন্তু গ্রহন করেনি একটিও। (উক্তি শেখ হাসিনার)
বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে কথা বলার সময় সংসদে বাধা দেওয়া হয়েছে	৮৬বার (উক্তি শেখ হাসিনার)
আওয়ামীলীগের অন্যান্য সদস্যরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন	২১৬ বার

উৎস ঃ দৈনিক যুগান্তর ৫ই অক্টোবর ২০০১

এ সংসদ চলাকালে স্বধীনতার পর কোন সংসদ সদস্য নির্মমভাবে নিহত হন । এ সংসদের সদস্য সাবেক অর্থমমন্ত্রী শাহ এ. এম. এস কিবরিয়া এবং আহসান উল্লাহ মাস্টার সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন। কিন্তু এ বিষয়ে বিরোধী দলকে সংসদে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি । এ সংসদ জনকল্যাণকর সংসদের পরিবর্তে হয়েছে নিস্প্রাণ সংসদ । বিরোধী দলের ভাষ্য ছিল যে, ৮ম জাতীয় সংসদ সরকারি দলের দম্ভ প্রকাশের মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পরই বিরোধীদল অর্থাৎ আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীদের উপরে নেমে আসে নানা রকম নির্যাতন। নির্যাতনের শিকার হয়, বিভিন্ন সংখ্যালঘু পরিবার।

সংসদ অধিবেশন প্রথম থেকেই বর্জন করার সাথে সাথে বিরোধী দল সরকার পতনের আন্দোলনের কথা বলে। চলতে থাকে হরতাল, অবরোধ। ২০০৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের "ডেড লাইন" হিসেবে ঘোষণা করে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল। কিন্তু তার এ ঘোষণা গোষণাই থেকে যায়। ২০০৪ সালের ২১ শে অক্টোবর আওয়ামীলীগের সমাবেশে যে গ্রেনেড হামলা চালানো হয় তা নিয়েও বড় কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি আওয়ামীলীগ। তবে এ সময় বিরোধী জোট গঠন করা হয় যার নাম দেয়া হয় "১৪ দলীয় জোট"। তারা একসঙ্গে আন্দোলন করা শুরু করে।

এমতাবস্থায়, বিরোধী দল সংসদের বাইরেও আন্দোলন করতে উৎসাহিত হয়। এই ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরপরই বিরোধী দল অর্থাৎ আওয়ামীলীগ এর নেতা কর্মীদের উপর নেমে আসে নির্যাতন।

৮ম জাতীয় সংসদের শেষ পর্যায়ে এসে বিরোধী দলের হরতাল, অবরোধ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ক্ষতি হয় জানমালের। তবে এ সময় বিরোধী দল একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপায় বের কওে । তা হলো সারাদেশে একযোগে মানববন্ধন। সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর ফলে তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার সুযোগ লাভ করেন বিচারপতি কে. এম হাসান। ২০০৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পল্টনের মহাসমাবেশ থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রী এম. হাসানের প্রধান উপদেষ্টা হওয়া ঠেকাতে দলীয় নেতাকর্মীদের ২৮ অক্টোবর লগী, বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার নির্দেশ দেন। ২৭ শে অক্টোবর থেকে ঢাকার পল্টন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। নিহত হয় প্রায় ১৪জন নেতা কর্মী। এর পূর্বে বি.এন. পি. -র মহাসচিব এবং আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক একটি সমঝোতায় পৌঁছার জন্য কয়েক দফা সংলাপে বসেন। কিন্তু তাদের এই সংলাপ কোন সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়। তারই ফলশ্রুতিতে পল্টনের হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।

বি.এন.পি তথা চারদলীয় জোটের দাবি যে, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সরকার উন্নয়নের গতি ধারাকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু বিরোধী দল দাবি করে যে, দুর্নীতি রোধে সামান্যতম অগ্রগতি হয়নি বরং জোট সরকারের আমলে ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ এবং ২০০৫ এই চার বছর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে এক নম্বর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, টেন্ডার, ঠিকাদারি, নির্মাণ,

Dhaka University Institutional Repository

পরিবহন, প্লট বরাদ্দ, বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, বিচার সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ছিল এক সাধারন ব্যাপার। এমনকি একটি দেশের দূতাবাস প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ এনে সে দেশের সাহায্য প্রত্যাহার করে নেয় জোট সরকারে আমলে। গত ৫ বছরে জোটের মন্ত্রী এবং এমপিরা ৩৫ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিরোধী দল বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহের ব্যাপারেও ব্যাপকভাবে সমালোচনা করে। তারা অভিযোগ করে যে, ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ আওয়ামীলীগের শাসনের শেষ সময়কাল পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ অনেক বেশি ছিল; কিন্তু জোট সরকারের আমলে এর প্রবাহ অনেক কমে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় -৭ ঃ

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের (২০০১-২০০৬) কার্যকারিতায় বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে একটি সমীক্ষা পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যে ভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া গবেষণাটিকে সময়পযোগী ও বাস্তবমুখী করতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচিত হলোঃ

মতামত প্রদানকারীদের সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলী

জনসাধারণের মতামত জরীপের ক্ষেত্রে স্তরীভূত দৈবচায়িতভাবে বিভিন্ন স্তরের ১০০ জন উত্তর দাতা থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে লিঙ্গ, অর্থনৈতিক শ্রেণী, পেশা শ্রেণীর মধ্যে সম্ভব সমতা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক মতামত প্রতিফলিত হয়।

চিত্র-৪: মতামত প্রদানকারীদের হার:

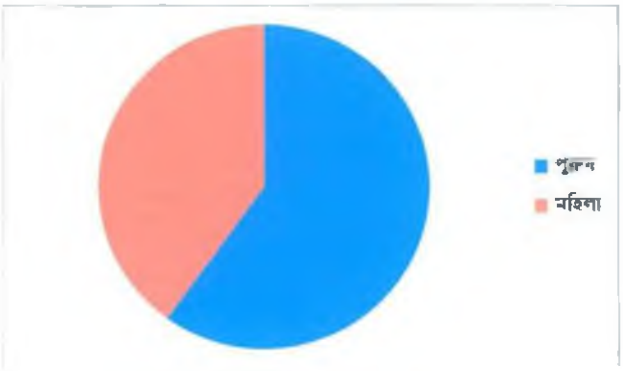

রেখাচিত্র অনুযায়ী মতামত প্রানকারীদের মধ্যে পুরুষের হার ছিল ৬০% অপরদিকে মহিলাদরে হার ছিল ৪০%। অর্থাৎ এই শতকরা হারে সমাজে নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর মতামতের সম্মিলিত রূপ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রদান কারীদের বয়সসীমাঃ

আলোচ্য গবেষণায় বিভিন্ন বয়সের উত্তর দাতাদের থেকে মতামত সংগৃহীত হয়েছে। তবে মতামত প্রদানকারীদের বয়স সীমা ছিল ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তি হতে মতামত গৃহীত হয়েছে।

টেবিল-২৮: মতামত দান কারীদের বয়সসীমা

বয়স	গণসংখ্যা
১৮-২৭	১৫
২৮-৩৭	২৩
৩৮-৪৭	২৫
৪৮-৫৭	২০
৫৮-৬৭	১১
৬৭-৭৭	৬

টেবিলে দেখা যায় যে, ২৮-৫৭ বছরের মধ্যে অধিকাংশ মতামত দানকারীর বয়স বা ৬৮% সর্বাধিক মতামত গৃহিত হয়। এর মধ্যে ৩৮-৪৭ বছরের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ২৫% মতামত গৃহিত হয়েছে। এর পর পর্যায়ে ক্রমে ২৮-৩৭ বছরের মধ্যে ২৩%, ৪৮-৫৭ বছরের মধ্যে ২০% এবং সর্বনিম্ন ৬৮-৭৭ বছরের মধ্যে ৮% মতামত দান কারীদের মতামত গৃহীত হয়।

চিত্র-৫: মতামত দান কারীদের বয়স সীমা

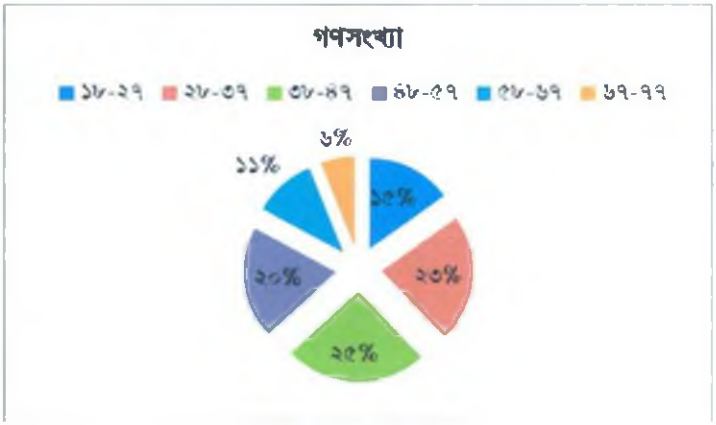

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাশ্রেণী:

গবেষণার সুবিধার্থে মতামত প্রদানের জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি. (তবে ৪৫ তদুর্ধ্বে জন্য ৮ম শ্রেণী) নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের মতামত প্রদানকারীর মতামতে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও বেশী ক্ষেত্রেই তা সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, গবেষণার বিষয়টি যেহেতু রাজনীতি এবং বিরোধীদল সম্পর্কিত তাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত শ্রেণীকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামতের ক্ষেত্রে সমান তাই বিষয়টিকে বিবেচনা করে শিক্ষা শ্রেণী নির্ধারণ করা হয়েছে।

টেবিল-২৯: মতামত দানকারীদের শিক্ষাশ্রেণী

শিক্ষাস্তর	গণসংখ্যা
৮ম শ্রেণী	১০
এস.এস.সি	১৫
এইচ.এস.সি	২০
স্নাতক	৩০
স্নাতকোত্তর	২০
তদুর্ধ্ব	৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬: মতামত দানকারীদের শিক্ষাশ্রেণী

সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মতামত প্রদানকারী উত্তর দাতার শিক্ষাস্তর ছিল স্নাতক ৩০% ।এরপরেই সমান সমান অবস্থান করে স্নাতকোত্তর ও এইচ.এস.সি। উল্লেখ্য যে উত্তর দাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরকে ৬টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

মতামত দানকারীদের পেশাঃ

পেশার উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রদত্ত মতামদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা মানুষ সব সময় যেকোন বিষয় বা সমস্যা সমাধানের নিজের অবস্থান থেকে চিন্তা করেন। আলোচ্য গবেষণায় মতামত প্রদান কারীদের পেশাগত অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী মতামত গৃহিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। ২৫% এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ ৬৫% ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থী। তাছাড়া, মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ২০% এভাবে পর্যায়ে ক্রমে এনজিও কর্মী, দিনমজুর, সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক পেশার ব্যক্তি বর্গের কাছ হতে যথাসাধ্য মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। যারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং নির্বাচনে ভোট দানে অত্যন্ত উৎসাহী ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বার্থে নিজের মতামত গবেষককে জানাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৩০: মতামত দানকারীদের পেশা

পেশা	গণসংখ্যা
শিক্ষার্থী	৩৫
ব্যবসায়ী	১১
ডাক্তার	২
ইঞ্জিনিয়ার	২
শিক্ষক	১৫
গৃহকর্মী	১০
এনজিও কর্মী	১০
সংসদ সদস্য	১৫

চিত্র-৭: মতামত দানকারীদের পেশা

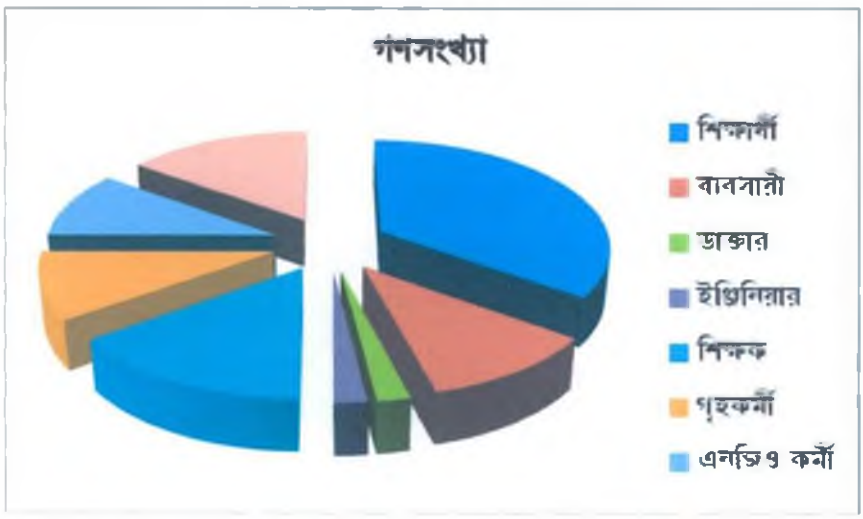

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত:

বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া অধিকাংশ মতামত দাতার উত্তর প্রায় একই রকমের। এক্ষেত্রে ৮৫% বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে জানে।

Dhaka University Institutional Repository

বাকী ১৫% সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ৮৫% মতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু সাংবাধানিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে সিংহভাগ মতামতদানকারীদের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। বাকী ১৫% জনসাধারনের মতামত অস্পষ্টতা দেখা দিলেও তাদের ধারণা বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি হল একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ প্রধাণমন্ত্রীই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রে সংসদ ও বিরোধী দল হল নিস্প্রান।

সংসদীয় ব্যবস্থা সফলতা:

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশে বর্তমানে যে সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে-এ বিষয়ে অধিকাংশ মতামত দাতার উত্তর প্রায় একই রকমের। টেবিল ও রেখচিত্র দেখা যায় যে ৪৮% জনসাধারণ মনে করেন বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র এখনো পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়েই অবস্থান করেছে। ৩০% মতামত দাতা মনে করেন ভবিষ্যতে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ১৬% মতামতদাতা সফলতা অর্জনের প্রশ্নে মনে করেন এখনো এ ব্যবস্থা মোটামুটি পর্যায়ে রয়েছে। আর বাকী ৬% মনে করে এ ব্যবস্থা কখনোই কার্যকরী হবে না।

টেবিল-৩১: সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত

মতামত	গণসংখ্যা
এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে	৪৮
ভবিষ্যতে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা	৩০
মোটামুটি পর্যায়ে রয়েছে	১৬
কখনোই কার্যকরী হবে না	৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৮: সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতা প্রশ্নে জনসাধারনের মতামত

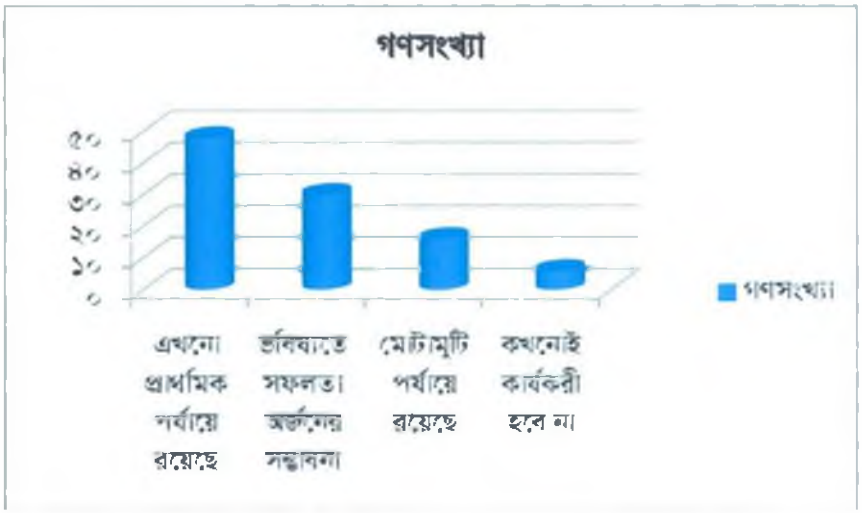

অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা:

অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত হলো পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস একটি মাইলফলক। তাদের মতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের শুরুতে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যমত লক্ষ করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃসূচনা ঘটে। তবে বিরোধী দলের ভূমিকার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতা মতামত প্রায় একই রকমের। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত প্রায় একই রকমের। এ ক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামত হলো পঞ্চম সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের ভূমিকা ছিল গৌণ যা এখনো প্রান্তিকত পর্যাইে রয়ে গেছে। শুধু বিরোধী দলেল ভূমিকার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত প্রায় একই রকমের। শুধু বিরোধী দলের ভূমিকাই গৌন ছিল না; এক্ষেত্রে সরকারী দলে মধ্যেও আন্তরিকতা ও সমঝোতার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামত থেকে একটি (Ven Diagram) উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র-৯: পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতিবাচক ভূমিকার কারণ

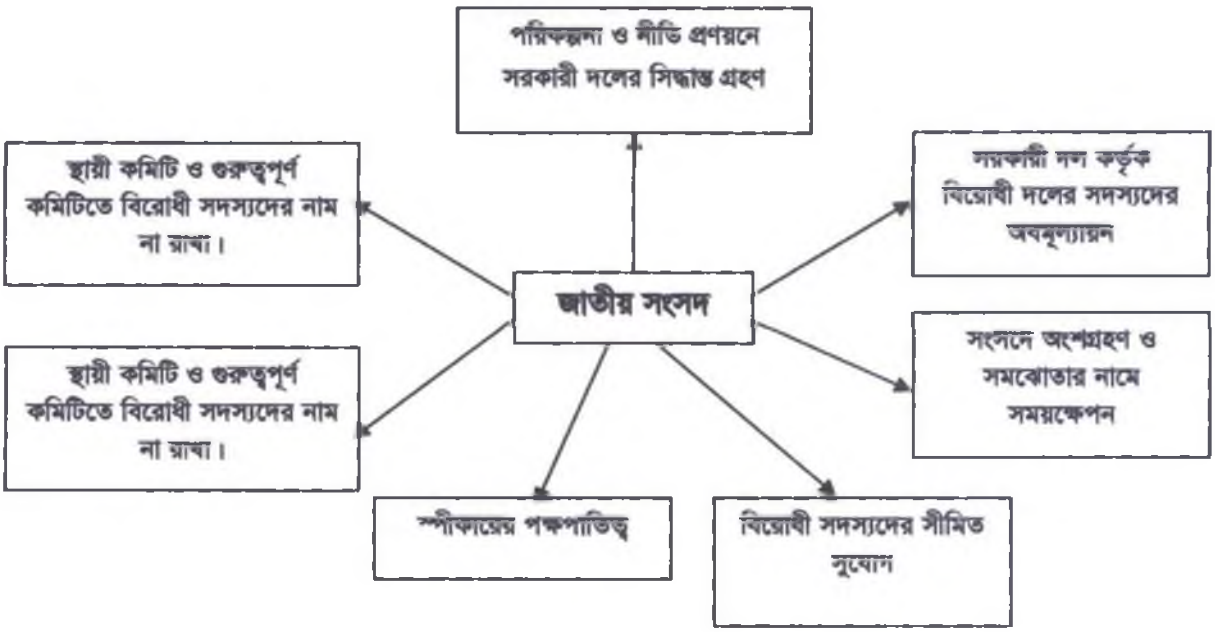

পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন

যেকোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই বিরোধীদলের সংসদ বর্জন গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে না। এক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামত হলো বিরোধীদলের সংসদ বর্জন বাংলাদেশে একটা রেওয়াজ হিসেবে পরিণত হয়েছে। যা কখনোই জনসাধারণ সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে জনসাধারনের মতামতের মধ্যে একটি ভিন্নদিক নির্দেশ বেরিয়ে এসেছে। তাহলো সংসদ বর্জন ৯০ কার্য দিবস পূর্ণ করলে ঐ সংসদ সদস্যের পদ শূন্য হয়। এই ৯০ কার্যাদি কমিয়ে ২৫ কার্জ দিবস করার অভিমত ব্যক্ত করেছে সাধারণ মানুষ। এতে করে সংসদ বর্জন অনেকটা হ্রাস পাবে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া বর্জনের পরিবর্তে ওয়াক আউটকে জনসাধারন গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রিবোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ভূমিকাঃ

বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে জনসাধারন স্পীকারের দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন। তাদের মন্তব্য হলো স্পীকার যদিও দল থেকে নির্বাচিত হয় কিন্তু স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার পর স্পীকারের উচিত নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করা। কেনা স্পীকার হলো সংসদের অভিভাবক। তাহলে সংসদ যেমন প্রাণবন্ত হবে তেমনি সরকারী ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবে। তবেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিকীকরনের পর্যায়ে উন্নত হবে।

বিরোধী দলে অতীত ও বর্তমান দায়িত্ব পালনঃ

বিরোধী দলের দায়িত্ব হচ্ছে সংসদে জনসাধারণের সমস্যাবলী তুলে ধরা এবং সরকারের যে কোন স্বেরাচারী নীতির বিরোধীতা করা। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের সংসদের বাইরে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা যেমন অগণতান্ত্রিক ঠিক তেমনি সরকারী দলের ভূমিকাও অগণতান্ত্রিক এমনিই মন্ত ব্য করেছে সিংহভাগ মতদাতা। অতীত এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা কালে দেখা যায় যে, ৫ম জাতীয় সংসদে যে দল বিরোধী ৭ম সংসদে সেই দলই আবার সরকার গঠন করে। এ ক্ষেত্রে ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকার মধ্যে কোন ব্যাতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি অষ্টম সংসদেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউটঃ

বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউটকে অধিকাংশ জনসাধারণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে ঘন ঘন বিরোধী দল কর্তৃক ওয়াক আউট সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে আদৌ কাম্য নয়। তবে জনসাধারণের প্রস্তাব হলো সুস্থ পরিবেশই দিতে পারে সুন্দর সংসদ বির্তক।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে বিরোধী দলের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার উপায়ঃ

আলোচ্য গবেষণায় এ প্রশ্নের জবাবে উত্তর দাতাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য পূর্ণ বক্তব্যের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে ৪০% উত্তরদাতা মনে করেন সংসদে বিরোধী দলের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য বিরোধী মতামতের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজনে । অপর পক্ষে ৩০% উত্তরা দাতা স্পীকারের নিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রশ্নতুলেন। তাদের মতে স্পীকারের পদটি অত্যন্ত সম্মানজন এক্ষেত্রে স্পীকার য দলেরই হোক তার নিরপেক্ষতা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে অত্যন্ত সহায়ক।

টেবিল-৩২: সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায়ঃ-৪৫

মতামত	গণসংখ্যা
১। বিরোধী মতামতের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।	৪০
২। সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলকে সুযোগ দান	৩৫
৩। স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চত করুন	২৫

চিত্র-১০: সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায়

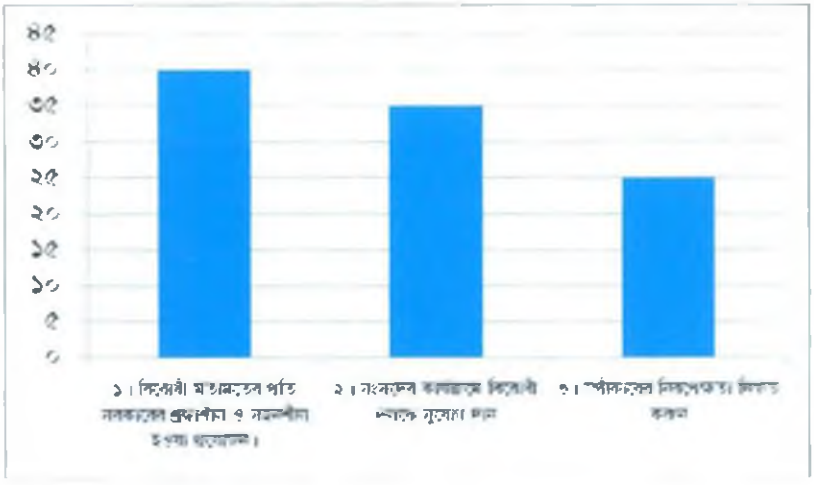

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি বৈষম্য

বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের তুলনায় বিশেষ কোন বৈষম্যের শিকার হয় বলে আপনি মনে করেন? এ প্রসঙ্গে মতামত প্রদানকারীরা নানাবিধ মতামত প্রদান করেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক মতামত দাতা অর্থাৎ ৪৫% মনে করেন সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে ও সরকারী বরাদ্ধ লাভের ক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় সদস্যরা বৈষম্যের শিকার হন। তাছাড়া ১৫% মনে করেন ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে, ২০% মনে করেন স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে, অপর পক্ষে ২০% মনে করে সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে তারা সরকার দলীয় সংসদ কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হন।

টেবিল-৩৩: বিরোধী দলের সদস্যদের বৈষম্য

মতামত	গণসংখ্যা
সংসদের বক্তব্য রাখাও সরকারী বরাদ্ধ লাভের ক্ষেত্রে	৪৫
ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে	১৫
স্থায়ী কমিটিতে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে	২০
সরকারী সুযোগ সুবিদা লাভের ক্ষেত্রে	২০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১১: বিরোধী দলের সদস্যদের বৈষম্য

বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গেঃ

বিরোধী দলের হরতাল সমর্থন করেন কি না এপ্রশ্নের উত্তরে ৯০% বলেছেন করেন না। ৫% বলেছেন এর বিকল্প কোন আন্দোলনও তো নেই। ৫% কোন উত্তর দেননি।

টেবিল- ৩৪: বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গে মতামত

মতামাত	গণসংখ্যা
হরতাল সমর্থন করেনা	৯০
বিকল্প কোন আন্দোলন নেই	৫
মতামাত দেননি	৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১২: বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গে মতামত

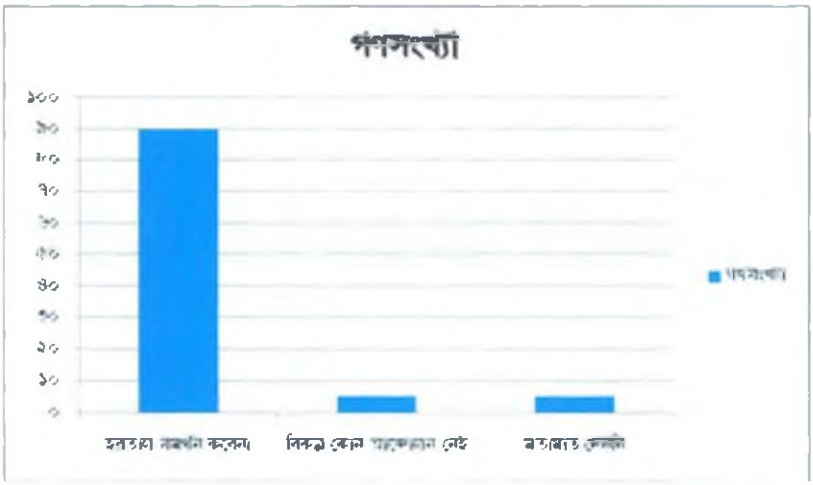

হরতাল বন্ধে আইন করা উচিত

আইন করে হরতাল বন্ধ করা উচিত কিনা এর উত্তরে ৮৫% বলেছেন আইন করে বন্ধ করা উচিত। ১০% বলেছেন আইন করে বন্ধ করা উচিত নয়। ৫% কোন উত্তর দেননি।

টেবিল-৩৫: হরতাল বন্ধে আইন করা উচিত কিনা এ সম্পর্কে জনগণের মতামত

মতামত	গণসংখ্যা
আইন করে হরতাল বন্ধ করা উচিত	৮৫
বন্ধ করা উচিত নয়	১০
উত্তর দেননি	৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১৩: আইন করে হরতাল বন্ধ করার বিষয়ে মতামত

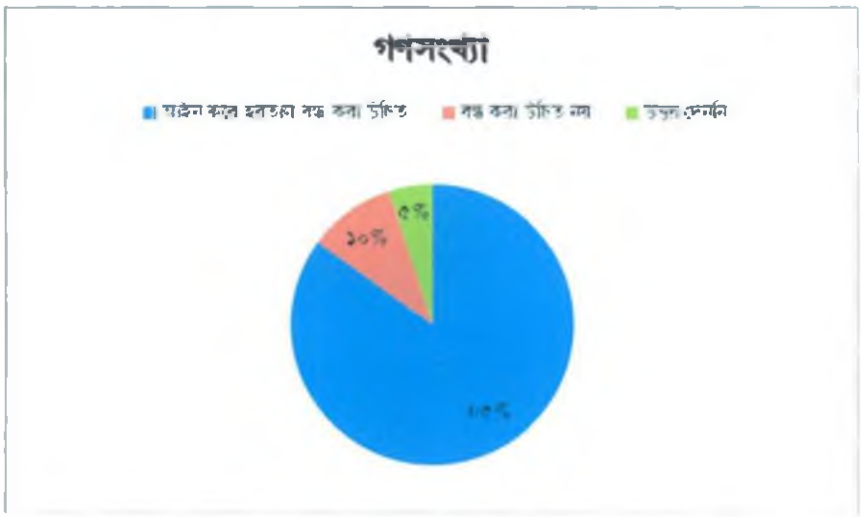

রাজনীতিতে বিরোধী দল যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনাঃ

রাজনীতিতে বিরোধী দল যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৮০% উত্তর দাতা বলেছে করছে। ২০% বলেছে করছে না।

টেবিল -৩৬: সংসদে বিরোধী দল যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা এ প্রসঙ্গে জনগণের মতামত

মতামাত	গণসংখ্যা
দায়িত্ব পালন করছে না	৮০
দায়িত্ব পালন করছে	২০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১৪: রাজনীতিতে বিরোধী দল যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কি না সে বিষয়ে মতামত

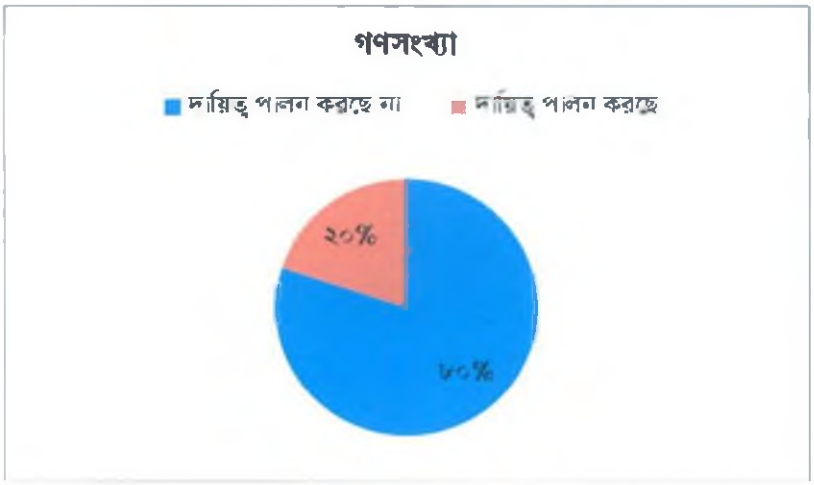

জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে বিরোধী সদস্যদের সমস্যা

এ প্রশ্নের উত্তরে সিংহভাগ উত্তর দাতা একবাক্যে বলেছেন বিরোধী দলীয় সদস্যগণ যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হন ঐ এলাকায় সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে যা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। এ সমস্যা দূরীকারনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের মতামত হলো সরকারী দলের সহযোগীতা ও স্পীকারের নিরপেক্ষতাই জাতীয় সংসদে বিরোধী সদস্যদের দায়িত্ব পালনকে আরো অর্থবহ করে তুলবে।

সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐক্যমত

প্রসঙ্গঃ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমত একান্ত অপরিহার্য। প্রশ্নের জবাবে দেখা যায় অধিকাংশ জনসাধারণই মনে করেন ঐক্যমত ও সমঝোতা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সহনশীল মনোভাব, পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ। তাছাড়া, রাজনৈতিক সহকর্মী কর্তৃক সহযোহিতার মনোভাব পোষন, সাংবিধানিক অঙ্গিকার রক্ষা, জাতীয় স্বার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত হলেই সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বপ্ন একদিন বাস্তাবায়িত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সে ফলাফলসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ প্রদত্ত হল-

গবেষণা ফলাফল

আলোচ্য গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত হতে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার সাথে এ দেশের জনগণের দীর্ঘ দিনের সম্পৃক্ততা রয়েছে তথাপি, সংসদীয় শাসন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সংস্কৃতি এখানো পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সংসদীয় শাসন্যবস্থার যে মুল প্রতিপাদ্য "Rules of the game" অর্থাৎ সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতামূলক সম্পর্ক এখন পর্যন্ত অর্জিত হয় নি। বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার সফলতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত জরীপ হতে দেখা যায় ৬০% জনসাধারণ মনে করেন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুরিপুরি কার্যকর হয়নি অর্থ্যাৎ তা এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। ২০% মতামত দাতা মনে করেন ভবিষ্যতে সফলতা অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে । ১৫% উত্তরদাতা মনে করেন এ ব্যবস্থা এখানো মোটামুটি পর্যায়ে রয়েছে। বাকী ৫% উত্তরদাতা বাংলাদেশের এ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মোটেও আশাবাদী নন। বিরোধী দলের হরতাল, অবরোধের বিপক্ষে বলেছেন ৮৫% জনসাধারণ । ১০% এই আন্দোলনের বিকল্প নেই বলে বলেছে এবং ৫% কোন উত্তর দেননি।

বিরোধী দলের সুদৃঢ় উপস্থিতি সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় সংস্কৃতিতে তাই বিরোধী দলকে His/Her Majesty's Opposition অথবা Alternative to government বলা হয়ে থাকে। এ দিকে হতে বিচার করলে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা এখানো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। পঞ্চম সপ্তম এবং অষ্টম সব সংসদই এক দীর্ঘ সময় বিরোধী দল বিহীন অবস্থায় ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪০০ কার্য দিবসের মধ্যে ১১৮ দিন এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের ৩৮৩ কার্যদিসের মধ্যে ১৬৫ দিন ৮ম সংসদের প্রায় দেড় বছর বিরোধী দল ব্যতীত পরিচালিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের এরূপ প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন সংয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

বিরোধী দলের অনুপস্থিতি সংসদের সার্বিক কার্যক্রমের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে বলে পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য হতে পরিলক্ষিত হয় বিরোধী দলের অনুপস্থিতি সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্ব হতে শুরু করে প্রায় প্রতিটি সংসদীয় কার্যক্রমকে ব্যাহত করে থাকে। পঞ্চম এবং সপ্তম উভয় সংসদের বিরোধী দলের অনুপস্থিতির ফলাফল আলোচ্য গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য হতে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের আচরণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকার ও বিরোধীদলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে সংসদীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে গত এক যুগেরও অধিক সময়ে তা যথার্থভাবে কার্যকর হতে পারে নি। পঞ্চম এবং সপ্তম ও ৮ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতিবাচক ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মতামতদানকারীগণ যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন তা হল-

১. পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারী দলের একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা।

২. সরকারী দল কর্তৃক বিরোধী দলের সদস্যদের অবমূল্যায়ন।

৩. বিরোধী দলের সদস্যদের সীমিত সুযোগ।

৪. সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

৫. স্পীকারের পক্ষপাতিত্ব মূলক আচরণ।

সংসদে বিরোধীদলের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতামত দাতা স্পীকারের ভূমিকার কথা বলেছেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় স্পীকরের পদটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসেবে বিবেচন করা হয়ে থাকে। কেননা স্পীকার হচ্ছেন সংসদের অভিভাবক স্বরূপ আর সে ক্ষেত্রে দলমত

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে সকলের নিকট তার গ্রহণ যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদীয় সংস্কৃতিতে স্পীকার পদটি সরকারী দলেকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ তাঁর কাছ থেকে নিরপেক্ষ আচরণ পান না।

তাছাড়া, কার্যপ্রণালী বিধিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধীদলের সুযোগের স্বল্পতা তাদেরকে সংসদ বিমুখ করে তুলেছে। বিরোধী দলকে সংসদের ফিরিয়ে আনা বা সংসদের তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রশ্নে ৪০% উত্তরদাতা মনে করেন এক্ষেত্রে বিরোধী দলের প্রতি সরকারকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ৩৫%উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ দান এবং ২৫% উত্তরদাতা স্পীকারের নিরপেক্ষতার কথা বলেছেন।

পরিশেষে বলা চলে, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধাচের যে সংসদীয় ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত তা সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী নানা পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। বিশ্বেও উন্নত রাষ্ট্রসমূহ যথা গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন চর্চার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনায় সক্ষম হয়েছে। এ ব্যবস্থার সফলতা অর্জন করতে হলে এর অর্ন্তনিহিত দর্শনসমূহকে চর্চা বা অনুশীলন করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজনে তা হল সরকার ও বিরোধীদলের প্রতি পারস্পারিক প্রতিশ্রুতি যে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে তারা সফলতার পথে এগিয়ে নেবে। সরকার ও বিরোধী দলের ঐক্যমত্ত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১০

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতায় বিরোধী দলের ভূমিকা প্রসঙ্গে করনীয়

Dhaka University Institutional Repository

একটি কার্যকর ও সশৃংখল সংসদের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে একজন নিরপেক্ষ দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্পীকারের উপস্থিতি । প্রধান ও অপ্রধান সকল বিরোধী দলের প্রতি এবং সকল স্বতন্ত্র সদস্যের অধিকারের প্রতি স্পীকারকে সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের এ গুরুত্বপূর্ণ পদটি এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া এ উভয় সংসদেই বিভিন্ন সময় দলীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে স্পীকার পদটি বিতর্কিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার মতামত জরীপে দেখো গেছে ৬০% লোক মনে করেন সংসদে বক্তব্য প্রদান বা ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আর এ বৈষম্যের নিরসন কেবলমাত্র করতে পারেন একজন স্পীকার।

জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সপ্তাহের মাত্র একটি দিন বৃহস্পতিবার বেসরকারি কার্যাবলী প্রাধাণ্য পাবে বলে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে ঐ দিন অন্য কাজ অর্থ্যাৎ সরকারী কাজও চলতে পারে। বেসরকারী কার্যদিবস কেবলমাত্র বিরোধী দলের সদস্যগণ নয় সরকার দলের ক্যাবিনেট সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ ও র্নিদলীয় সদস্যগণ উক্ত দিবসে কাযক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম। যার ফলশ্রুতিতে বেসরকারী সদস্যদের কার্যক্রমের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় Opposition day নামক বিরোধী দলের জন্য পৃথক দিবসের প্রচলন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের একটি বিশেষ দিক হল মাত্রাতিরিক্তভাবে ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন। প্রধানত সংসদে কথা বলতে না দেওয়া ও বিরোধী দলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করায় শুধুমাত্র সংসদীয় রাজনীতির বিকাশধারা বাধাগ্রস্থই হচ্ছে না তা আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার ভবিষ্যতকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। এ ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপসমূহ নেওয়া প্রয়োজন তা হলো-

প্রথমত- বিরোধী দলকে শর্তহীনভাবে সংসদ অধিবেশনে আসতে হবে।

দ্বিতীয়ত- সরকারী দলকে বিরোধী মতামতের প্রতি শদ্ধাশীল এবং সহিষ্ণু হতে হবে এবং তাদের প্রতি সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদলকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আইন প্রণয়নের যে প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে তার পরিবর্তন আনতে হবে।

সংসদকে সরকারী দলের রাবার স্ট্যাম্পে রুপান্তিরিত না করে একে সত্যিকার অর্থে কার্যকারী করে গড়ে তুলতে হলে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার সাধন করতে হবে। এ অনুচ্ছেদের সংস্কারের মধ্য দিয়ে এক অর্থে সরকারের দায়িত্বশীলতা অর্জনের পথ সহজ হবে। বিল উথাপন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরোধীদলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে কার্য প্রণালী বিধির সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। মতামত প্রদানকারীর মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ জনগণের কার্যপ্রণালী বিধির সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে। বিরোধী দলকে হরতাল অবরোধ পালন না করার অঙ্গীকার করতে হবে।

হরতাল অবরোধ পালন না করতে আইন জারি করা যেতে পারে। বিরোধী দলের প্রকৃত কার্যকারিতা অর্জন করতে হলে ছায়া সরকার গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে বিরোধী দল আরো বেশী গঠনমূলক সমালোচনা এবং পরামর্শ দিতে সক্ষম হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলগুলো এখনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলস্বরূপ আমরা সরকারি ও বেসরকারি উভয় দলকেই দায়ী করতে পারি। সরকারি দলের অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও বেসরকারি দলের একগুয়ে হরতাল, অবরোধ এবং সংসদ বর্জন আজ আমাদের সম্মুখে প্রশ্নবিদ্ধ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারের নীতিমালাসমূহকে আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে ভূলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরে একটি জনমত গড়ে তুলে সঠিক নীতিমালা অবলম্বন করতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশ এমনও বিল এবং জাতীয় ইস্যু পাশ হয়েছে যেখানে বিরোধী দলের কোন ঐক্যমত ছিল না যেমন- সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন বিল, গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি এবং পার্বত চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে দল যখন বিরোধী থাকে সে দল তখন সবকিছুই নিজেদের মত করে বিরোধীতা করার চেষ্টা করে এবং সরকারি দলও নিজেদের প্রাধান্যতাকে কেন্দ্র করে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা চালায়। আগামী দিনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কতটুকু সফল হবে সেটাই এখন বিশেষজ্ঞদের মনে বড় পশ্ন। বর্তমান বিরোধী দল আগামী দিনে সরকারি দলের ভূমিকা পালন করবে। তাই উভয় দলকেই সেকথা স্মরণ রেখে দেশের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থতালিকা

Dhaka University Institutional Repository

১. Ahmed ,Moudud; Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman (Dhaka: UPL, 1983)

২. Ahmed,Nizam ;The parliament of Bangladesh.2002

৩. Ashraf, Ali; "Parliamentary Finance Committees in Bangladesh." Paper Presented at the Conference on Comparative, Constitutional law May 27-28 1999, Dhaka,

৪. Agarwal R.C (2003). Political Theory, Ram Nagar, New Delhi, P. 304

৫. Bangladesh Election Commission, Report of the Sixth Parliamentary Election, 1996, Dhaka: Bangladesh Government Press: 1996.

৬. Bangladesh Election Commission Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh,

৭. Bangladesh National Parliament (19966-99b), Nizam Ahmed Ibid.

৮. Bangladesh National Parliament (1991-94b), (1996-99c), Nijam Ahmed, Ibid.

৯. Birch, H. Anthony, The British system of Government (Alien Unwin, London 1986)

১০. Barker Earnest: Reflections on Government London, Oxford University Press, 1985.

১১. Birch Anthory H (1986)., The British System of Government, Allen& Unwin, London,.

১২. Chowdhury Nazma, The legislative Process in Bangladesh; Politics and functioning of the East Bengal Legislative 1947-*58* (Dhaka University Publication Bureau, Dhaka-1980)

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Dictionary of American Politics, 2nd ed, New York, Barnes and Boble Inc, 1968)

১৪. Dahl, Robert A, Political Opposition in Western Democracies, New Haven and London, Yale University Press,

১৫. Gettell, Raymond G.; Political Science, the world Press Private Ltd., 1st Published- 1950

১৬. Garner, Dr; Political Science and Government, ed, 1955.

১৭. Grolier Encyclopedia, New work and Toronto, The Grolier Society Publishers 1958,

১৮. Giizlling, D.A (ed.); Every man's Encyclopedia, vol- 9. London: J.M dent and sons Ltd. 1978

১৯. Harun, Shamsul Huda, Parliamentary Behaviour in a Multi-National Sate 1947-56 Bangladesh Experience, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh 1984

২০. Hasanujjaman Al Masud, Role of opposition in Bangladesh politics: the university press limited, Dhaka- 1998.

২১. Harun ,Shamsul Huda ; Parliamentary Behavior in a Multi National State 1947-58, Bangladesh Experience, Dhaka, 1984,

২২. Hakim, S. Abdul, Begum Khaleda Zia of Bangladesh; A Political Biography, New Delhi, Vikash Publishing House, 1992

২৩. Hossain Awal M.M. Awal Hossain (2003). Democracy in Bangladesh: Problems and Prospects, UNPA

২৪. Hervey and Bather, The British Constitution.

২৫. Hossain Shawkat Ara, Politics and Society in Bangle.

Dhaka University Institutional Repository

২৬. Islam, Nahid Nurul; Committee, Systems in Bangladesh Parliament. "Paper presented at the conference on comparative constitutional law", May 27-28, 1999, Dhaka,

২৭. Islam M. Nazrul, Consolidating Asian Democracy, October, 2003

২৮. Jennings, W. Ivor, Parliament, London, Cambridge University Press 1970; Second ed.

২৯. Jahan, Rounaq; Bangladesh politics: Problems and issues, Dhaka University Press 1980.

৩০. Jennings, Sir; Cabinet Government, London University Press, 1961 Reprint.

৩১. Khan, Abdul Moyeen; "The oversight Role of Opposition in the committee system." Paper presented at the conference on comparative constitutional Law, May 27-28 1999, Dhaka,

৩২. Lindsay, A.D: The Essentials of Democracy, London, Oxford University Press 1935.

৩৩. Laski Harold J (1932); Democracy in Crisis, London: George Allen and Unwin Ltd. P-32.

৩৪. Masoom, Abul latif; Zia Regime, P: 116.

৩৫. Maclver R. M. ; The Modern State London, Oxford University Press, 1926

৩৬. Moniruzzaman Talukder (1994). Politics and security of Bangladesh, UPL.; Dhaka

৩৭. Norton Philip & Nazim Ahmed (ed.) (1999). "Parliaments in Asia.

৩৮. Phart, Arned Lij; Democracy in Plural Societies, New Heaven: Dhaka University Press, 1977

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. Pirjada, Syed Sharifuddin (ed); Foundations of All India Muslims League Documents, 1906-1947 Vol – Vi, Uarachi National Publishing House, 1970

৪০. Ranwick Alan and Lan Swinburn (1983). Basic Political Concepts, Hulichin Son & Co., P. 96

৪১. The report of the Fair Election Monitoring Alliance. (FEMA) July, 1996

৪২. Quoted in Carl J. Friedrick 1947, Constitutional Government and Democracy, Massachusetts : James Bryce PP. 315-316

৪৩. Quoted in Hasanuzzaman Al Masud, (1998). Role of Opposition in Bangladesh Politics, UPL, Dhaka P-20

৪৪. Wheare, K.C. Legislatures, London: Oxford University Press 1968

৪৫. Ziring, Lawrence, Bangladesh From Mujib to Ershad: An Interpretive Study, Dhaka: University Press Ltd. 1992

৪৬. আহমদ, আবুল মনসুর; "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" প্রকাশক মহীউদ্দিন আহম্মদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০০ নবম সংস্করণ অক্টোবর ২০০০ ।

৪৭. খোন্দকার আব্দুল হক মিয়া, জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থা, কনফারেন্স পেপার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, Dhaka; UNDP, 999

৪৮. সপ্তম ত্রয়োদশ পর্যন্ত অধিবেশন পর্যন্ত বুলেটিনসমূহ হতে সংগৃহীত

৪৯. জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড ১, সংখ্যা ১৩, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯১

৫০. জাতীয় সংসদ বিতর্ক খন্ড- ১, সংখ্যা ৩, ১২ এপ্রিল, ১৯৭৩

৫১. জালাল ফিরোজ 'পার্লামেন্ট' কিভাবে কাজ করে ; প্রকাশক দিলীপ চন্দ্র রায়, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০০৩, ।

৫২. দৈনিক সংবাদ, ১৬ এপ্রিল, ১৩, ১৪ ও ১৫ মে ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. দৈনিক দিনকাল, ঢাকা ১৯ আগষ্ট ২০০০

৫৪. দৈনিক যুগান্তর; ৫ই অক্টোবর, ২০০১

৫৫. দৈনিক যুগান্তর; ২২ আগষ্ট, ২০০৪

৫৬. দৈনিক জনকণ্ঠ; ২৮ অক্টোবর, ২০০৬

৫৭. দৈনিক জনকণ্ঠ; ১০ অক্টোবর, ২০০৬

৫৮. দৈনিক যুগান্তর; ২১ আগষ্ট, ২০০৪ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৭৩-৭৫ (৭ম খন্ড)।

৫৯. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

৬০. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদে, ৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর ১৯৯৫, অধিবেশন কার্যবালীর সারাংশ

৬১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সূত্র থেকে প্রাপ্ত

৬২. হক, আবুল ফজল; শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ১৯৯৮ ।

৬৩. রশীদ, হারুন-অর-; বাংলাদেশঃ রাজনীতি সরকার ও শানতান্ত্রিক উন্নয়ন, ।

৬৪. ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান; ৬ষ্ঠ সংস্করণ ঢাকা, ১৯৯৭

৬৫. আহমদ, এমাজউদ্দিন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, মৌলি প্রকাশনা এপ্রিল, ২০০২

৬৬. ইসলাম সিরাজুল, সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

৬৭. রশিদ হারুন-অর, বাংলাদেশ জন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ ১৮৬১-২০০১, হাসিনা প্রকাশনা, জুলাই ২০০০.

৬৮. আহমেদ এমাজউদ্দিন (১৯৯১). বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র :প্রাসঙ্গিক চিন্ত্রাভাবনা

৬৯. ১১ অক্টোবর, ২০০৬, প্রথম আলো

৭০. ৬ অক্টোবর, ২০০৬, যুগান্তর

৭১. ২৮ অক্টোবর, ২০০৬, যুগান্তর

৭২. ২৮ অক্টোবর, ২০০৬, জনকণ্ঠ

৭৩. ৭ অক্টোবর, ২০০৬, সংবাদ

৭৪. ২৮ অক্টোবর, ০৬, ইত্তেফাক

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী

Dhaka University Institutional Repository

ক. সংসদ বিষয়ক সাংবিধানিক আইন

সংসদ প্রতিষ্ঠা ৬৫ (১) "জাতীয় সংসদ " নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যাস্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ আদেশ,বিধি, প্রবিধান,উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতা সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তি পত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২)একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমুহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে: সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন ।

[১] (৩) সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন,১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যামান সংসদের অব্যহিত পরবর্তী সংসদের পথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইননুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁর অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্টের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক শৃঙ্খলজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;

[২](ঘ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছেক না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

ব্যাখ্যা ঃ- যদি কোন সংসদ-সদস্য, যে দল তাঁহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া-

(ক) সংসদে উপস্তিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন, অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন সময় কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবিদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিত ভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহবান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদের তাঁহার আসন শূণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

অনুচ্ছেদঃ ৬৭। সদস্যদের আসন শূন্য হওয়াঃ (১) কোন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে,যদি (ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহন বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হনঃ তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারনে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;

(খ) সংসদে অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানে ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(২) কোন সংসদ সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং স্পীকার কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারনে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যর আসন শূন্য হইবে।

অনুচ্ছেদঃ ৬৮।সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতিঃ সংসদের আইন- দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ সদস্যগণ সেইরূপ ভাতা ও বিশেষ- অধিকার লাভ করিবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৬৯। শপথ গ্রহনের পূর্বে আসন গ্রহন বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদন্ডঃ কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধানঅনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা

Dhaka University Institutional Repository

অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ - সদস্যরূপে আসনগ্রহন বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

অনুচ্ছেদঃ ৭০।পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে আসন শূন্য হওয়া ঃ (১) কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ - সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

ব্যাখ্যা - যদি কোন সংসদ সদস্য,যে দল তাহাকে নির্বাচনে প্রার্থীরূপে মনোনীত করিয়াছেন, সেই দলের নির্দেশ অমান্য করিয়া –

(ক) সংসদে উপস্থিত থাকিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা

(খ) সংসদের কোন বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন, বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন সময়ে রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তাহা হইলে সংসদ সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হইবার সাত দিনের মধ্যে স্পীকার সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভার আহ্বান করিয়া বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করিবেন এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোন সদস্য অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থীরূপে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার পর কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন তাহা হইলে তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে সংসদ- সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭১(১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচিনী এলাকা হইতে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে

(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক , তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষর যুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন,অত:পর সেই সকল এলাকার আসন সমুহ শূণ্য হইবে;

(খ) এই দফায় (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং

(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমুহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথ পত্র বা ঘোষণা পত্র স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না ।

সংসদের অধিবেশন

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্টপ্রতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারন করিবেন।

[১২] তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে এই দফার আধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিত ভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্বেও সংসদ সদস্যদের যে কোন সাধারন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিযা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনাধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থায় বিদ্যামানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন,তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।

৫। এই অনুচ্ছেদের (১)দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যপ্রনালী বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমুহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী।

৭৩। (১)রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন ।

(২)সংসদ সদস্যদের প্রত্যেক সাধারন নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন ।

(৩)রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

[১৪]৭৩ক।(১)প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহন করিতে অধিকারী হইবেন ,তবে যদি তিনি সংসদ সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না [১৫] [এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সর্ম্পকে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন]।

(২)এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্র" বলিতে প্রধানমন্ত্রী [১৬] [[১৭] *]প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অর্ন্তভূক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

৭৪। (১) কোন সাধারন নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূণ্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পর্ণ করিবার জন্য সংসদ সদস্যদের মধ্যে হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূণ্য হইবে, যদি

(ক) তিনি সংসদ সদস্য না থকলে ;

(খ) তিনি মন্ত্রী পদ গ্রহন করেন ;

(গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উপস্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদ গৃহীত হয়;

(ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা

(ঙ) কোন সাধারন নির্বাচনের পা অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহন করেন; অথবা

(চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি ১৮ [রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে] কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠক স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারনের জন্য প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২)দফার বিধানবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহন করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। (১) এই সংবিধান সাপেক্ষে

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রনালী বিধি দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রনালী বিধি সংসদের কার্যপ্রনালী নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণয়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূণ্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরুপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না ।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭৬। (১)[১৯] * * * *সংসদ সদস্যদের মধ্যে হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেনঃ

(ক)সরকারী হিসাব কমিটি;

(খ)বিশেষ অধিকার কমিটি;এবং

(গ)সংসদের কার্যপ্রনালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি ।

(২)সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১)দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবংঅনুরুপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে।

(ক)খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ)আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;

(গ)জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ)সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ।

(৩)সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে।

(ক)সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ , ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের ;

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরুপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্ব সম্পর্কের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ণ করিবেন এবং অনুরুপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

৭৮। (১)সংসদ কার্যধারার বৈধ্যতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উথ্থাপন করা যাইবে না।

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালী বা নিয়ন্ত্রন, কার্য পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন এখতিয়ারের অধীন হইবে না ।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ সদস্যের বিরূদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না ।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট , কাগজপত্র , ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহন করা যাইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের কমিটিসমুহের এবং সংসদ সদস্যেদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

খ. জাতীয় সংসদ সচিবালয়

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারন করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন

Dhaka University Institutional Repository

করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

গ. প্রশ্নমালা

জনসাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্রঃ

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষ করা হবে।)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নংঃ	তারিখঃ
তথ্য সংগ্রাহকের নামঃ	
তথ্য সংগ্রহের স্থানঃ	স্বাক্ষরঃ

ক. সাক্ষাৎদাতার পরিচিতি

১। নামঃ ২। বয়সঃ

৩। পেশাঃ ৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

৫। ঠিকানাঃ

১। বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি না? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

২। ৫ম,৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকাতে আপনি কি সন্তুষ্ট? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

যদি আপনার উত্তর না হয় তাহলে মতামত দিন।

Dhaka University Institutional Repository

.....

.....

.....

৩। পঞ্চম সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে আপনি কি সমর্থন করেন?

(ক) হ্যাঁ (খ) না, যদি আপনার উত্তর না হয় তাহলে মতামত দিন।

.....

.....

.....

৪। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিরোধীদল কতটুকু দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

(ক) যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে

(খ) দায়িত্বশীলতার পরিচয়ই দিচ্ছে না।

৫। বিরোধী দল কর্তৃক ঘন ঘন ওয়াক আউট কে আপনি কি সমর্থন করেন? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

৬। সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান সুদৃঢ় করবার ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন-

(ক) বিরোধী মতামতের প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হওয়া প্রয়োজন।

(খ) সংসদের কার্যক্রমে বিরোধী দলকে সুযোগ প্রদান।

(গ) স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিশ্চায়তা করন।

৭। বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য সরকার দলীয় সংসদ সদস্যর তুলনায় বিশেষ কোন বৈষম্যের স্বীকার হয় বলে আপনি মনে করেন?

(ক) সংসদে বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে

(গ) স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে

(ঘ) সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে।

১১। জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে বিরোধী দলীয় সদস্যরা কি সমস্যার সম্মুখীন হন বলে আপনি মনে করেন? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

১২। বিরোধী দলের হরতাল কি সমর্থন করেন? (ক) হ্যাঁ (খ) না

১৩। হরতাল কি গণতান্ত্রিক পন্থা? (ক) হ্যাঁ (খ) না,

১৪। আইন করে কি হরতাল বন্ধ করা উচিৎ? ক) হ্যাঁ (খ) না।

১৫। রাজনীতিতে কি বিরোধী দল যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে? (ক) হ্যাঁ (খ) না।

যদি উত্তর না হয় তবে কেন পারছেনা?

.....

.....

.....

১৬। রাজনীতিতে আরো সক্রিয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারী দল বিরোধীদলকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

.....

.....

.....

১৭। আপনি কি মনে করেন ২০০১-২০০৬ সালের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কার্যকর ছিলো?

(ক) আংশিক

(খ) না

(গ) হ্যাঁ

Dhaka University Institutional Repository

১৮। এই সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকার কার্যকারিতা প্রশ্নে আপনার মতামত কি ?

১৯। আপনি যদি সংসদে বিরোধী দলের অকার্যকারিতার কথা সমর্থন করেন, তাহলে এটার পেছনে দায়ী কে?

(ক) সরকারী দল(খ) স্পিকার (গ) বিরোধী দল (ঘ) সকল পক্ষ

২০। তত্ত্বধায়ক সরকারের ধারনা কি সংসদীয় সরকারের ধারনার পরিপন্থী ?

২১। অষ্টম সংসদে সরকারী দল কতৃক আনীত ১৮৫ টি বিল পাশ হয়েছে তাতে বিরোধী দলের মতামত প্রকাশ হয়েছে কি ?

(ক) আংশিক

(খ) না

(খ) হ্যাঁ

২২। ৮ম জাতীয় সংসদ কি? জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরন করতে সক্ষম হয়েছে ?

(ক) হ্যাঁ

(খ) না

২৩। ৮ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অবিরাম সংসদ বর্জন কি যুক্তি সংঙ্গত ছিলো ?

(ক) আংশিক

(খ) না

(গ) হ্যাঁ

২৪। বিরোধী দলকে সংসদে আনতে এবং তাদের যথাযথ অধিকার প্রকাশের ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা কি গ্রহন যোগ্য ছিলো ?

(ক) আংশিক

Dhaka University Institutional Repository

(খ) না

(গ) হ্যাঁ

২৫। সংসদকে কার্যকারিতার দিক থেকে বিরোধী এবং সরকারী দল কি তাদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন করছে?

সরকারি দল- হ্যাঁ / না

বিরোধী দল- হ্যাঁ / না

উভয় দল- হ্যাঁ / না

২৬। সংসদীয় সরকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সরকারী এবং বিরোধী দলের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তির সংসদের বাইরে অনুষ্ঠিত সংলাপ কি সংসদকে অকার্যকর করার নামান্তর?

(ক) হ্যাঁ (খ) না

২৭। সংসদের কোরাম সঙ্কটের জন্য ৮ম জাতীয় সংসদ প্রায়ই অচল হয়ে ছিল এটি কি গ্রহণ যোগ্য ?

(ক) হ্যাঁ (খ) না